Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা বিনতে পিংকি

রোলঃ 216020175

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা বিনতে পিংকি
রোলঃ 216020175

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা বিনতে পিংকি, আইডিঃ 216020175 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Asma

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৪ ইং

আসমা বিনতে পিংকি

আইডিঃ 216020175

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ ١

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ٢
مَّـٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣

وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ٤

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, আর তাতে বক্রতার অবকাশ রাখেননি। যাতে সে তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সর্তক করে এবং সুসংবাদ দেয় সেসব মুমিনকে, যারা সৎকর্ম করে। নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, তাঁরা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। আর যেনো সর্তক করে তাদেরকে যাঁরা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহন করে।

(সূরা কাহাফ আয়াত ১ -৪)

প্রশংসা জ্ঞাপন করছি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি দয়া করে এমন এক কিতাব নাযিল করেছেন যা সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী স্বরুপ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষকে কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে সূরাতুল হাশরের ২১ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেছেন

لَوۡ اَنۡزَلۡنَا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَیۡتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ خَشۡیَۃِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلۡکَ الۡاَمۡثَالُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ یَتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۲۱﴾

এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণ গুলো পেশ করি ; হয়তো তারা চিন্তাভাবনা করবে। (সূরা হাশর আয়াত -২১)

দুরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূল ﷺ উপর যিনি হিদায়াত ও রহমত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি সুসংবাদদাতা ও সর্তককারী।আল্লাহর নির্দেশনুযায়ী তিনি তাঁর পথে আহ্বানকারী এবং আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ।আল্লাহ তাআ'লা তাঁর উপর ও তাঁর

পরিবার, পরিজন,সাহাবায়ে কিরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী সকলের উপর সালাত প্রেরণ করুন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকূলের উপর বিশেষ করে মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করে তাদের মধ্য থেকে প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলﷺ কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর নাযিল করেন পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। আল্লাহﷻ বলেন -

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি (অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর নিশ্চয় এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল। (সূরা আল -ইমরান আয়াত ১৬৪)

আল্লাহ কুরআনের বহু জায়গায় বলেছেন এই কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত,নূর,উপদেশবানী, মহাসাফ্যলের মাধ্যম। আল্লাহ সূরা ইসরার ২ নাম্বার আয়াত বলেছেন -

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾

আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা, ও রহমত। কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি বাড়িয়ে দেয়।

কুরআন মুমিনদের জন্য প্রথপ্রদর্শক। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন

الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ

আলিফ লাম মিম। এই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী। (সূরা বাকার আয়াত ১-২)

এতোসব আয়াত থাকার পর ও, কুরআনে বারবার খাস করে মুমিনদের কথা উল্লেখ করার পর ও বর্তমানে সমাজে মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা নেই বললেই চলে। কুরআন কে মুমিনরা এখন কেবল একটি ধর্মীয় কিতাব হিসেবে রমাদানে একবার খতমা আর মিলাদে হুজুর এনে তিলওয়াত অব্দিই রেখেছে। তাই বর্তমান সময়ে মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা এই প্রসঙ্গ নিয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ,বই, থিসিস লিখা সময়ের দাবি। কারণ একটি সমাজ, একটি মুসলিম রাস্ট্র এমন কি মুসলিম জাতি ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে যদি না তারা কুরআনকে তাদের জীবন ব্যবস্থার একমাত্র পাথেয়,একমাত্র সমাধানের আলোবর্তিকা হিসেবে বেছে না নেয়। আল্লামা ইকবাল এই জাতির এমন অধপতন দেখে বলেছেন -

‘ওহ যামানা মে মুআযযায থী হামেলে কুরআন হো কর

আওর তুম খার হুয়ী তারেকে কুরআন হো কর

অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগের মানুষ সম্মানিত ছিলেন কুরআনের বাহক হয়ে, আর তোমরা অপদস্থ হচ্ছো কুরআন ছেড়ে দিয়ে। ১

কবি ইকবাল যথার্থই বলেছেন। পুরো মুসলিম উম্মাহ আজ ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্তর্জাতিকভাবে যেখানেই অধপতন ও আগ্রাসনের শিকার, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর মূলে হলো পবিত্র কুরআন থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়া। সময় যত গড়াচ্ছে কুরআন থেকে আমাদের দূরত্ব ততোই বাড়ছে। কুরআন না আছে আমাদের সকালের তিলাওয়াতে, না আছে রাতের তিলওয়াতে। অথচ আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ِاقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِه.

তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার ‘ছাহিবের’ জন্য সুপারিশ করবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪

কুরআনের ছাহিব কে? মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, ‘ছাহিবে কুরআন’ বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যিনি কুরআন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকেন।

কুরআনের হেদায়েত ও বার্তাগুলো গ্রহণ করেন। কুরআনের বিধানগুলো আমলে নেন। কুরআনের হিফয করেন। মোটকথা কুরআনই থাকে তার জীবনের আরাধনা। (দ্রষ্টব্য : কূতুল মুগতাযী আলা জামিইত তিরমিযী ২/৭৩২)

আর আমাদের অবস্থা?

না আছে আমাদের পারিবারিক শাসনে কুরআন,, না আছে সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে কুরআন । কুরআন নেই আমাদের চেতনায়, নেই আমাদের দিনরাতের ভাবনায়। কুরআনের ভেতরে আমরা খুঁজি না আগামী দিনের প্রেরণা, কুরআন নিয়ে নেই আমাদের কোনো তাড়না। কুরআন নেই আমাদের জীবন সমস্যা সমাধানে, নেই উম্মাহর রাষ্ট্রীয় সংবিধানে। মহাগ্রন্থ নেই আমাদের বিচারে, নেই কুরআনের বাহকদের প্রচারে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সর্বক্ষেত্রে আমরা সর্বগ্রাসী অধপতনের শিকার হয়েছি।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ যেসব ক্ষেত্রে অধপতনের শিকার তার মধ্যে অন্যতম হলো নৈতিক অধপতন, বিজাতীয় সংস্কৃতি লালন, ধর্মহীন শিক্ষাগ্রহণ, নাস্তিকতা পালন, স্বৈরশাসকদের তোষণ, দুর্বল ও প্রতিবেশির প্রতি অবহেলা, নিজের স্বকীয়তা ভুলে যাওয়া, নববী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সত্যের পথে মানুষকে না ডাকা, অন্যায় থেকে বিরত না রাখা, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে বেপরোয়া মানসিকতা, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, বেপর্দা, ইসলামী খেলাফতের প্রতি অনীহা, উপনৈবেশিক শক্তির চাটুকারিতা, নিজ মাতৃভূমি অন্যের হাতে তুলে দেয়া, নিজ ভূমিতে অন্যকে দখল করে থাকতে দেয়া, প্রতিরোধশক্তি হারিয়ে ফেলা, ইসলামের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধব্যবস্থা অপাত্রে ব্যবহার করা ইত্যাদি। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, এ সমস্যাগুলোর প্রতিশেধক পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে কুরআনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আছে। কিন্তু আমরা তো কুরআন থেকে দূরে, বহু দূরে!

যে পবিত্র কুরআন আমাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সংবিধান সেই কুরআন আজ সংকুচিত হতে হতে নামাযের তেলাওয়াত, তাবিজ-কবজ এবং ইসালে সাওয়াবের খতমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কোনো সমস্যায় আক্রান্ত হলে আমরা মসজিদ-

মাদরাসায় গিয়ে কুরআনের একটি কপি হাদিয়া দিয়ে আসি, অথচ একবারও ভাবি না, এই কুরআন খুললেই আমি আমার সমস্যার সামাধান পেয়ে যেতাম! কারণ মহান আল্লাহ তাআলা তো মানবজাতির যাবতীয় সমস্যা ও প্রয়োজন খুলে খুলে বর্ণনা করার জন্যই কুরআন নাজিল করেছেন। কুরআনে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন-

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ۝

সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না, জলে-স্থলে যা আছে তা তিনি জানেন, এমন একটা পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না। **যমীনের গহীন অন্ধকারে কোন শস্য দানা নেই, নেই কোন ভেজা ও শুকনো জিনিস যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) নেই।** (সূরা আনআম 59)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.)-কে একলোক বলেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। উত্তরে তিনি বলেন, 'তুমি আল্লাহর কিতাবকে রাহবার হিসেবে গ্রহণ কর। কুরআনকে তোমার বিচারক বানাও। কারণ এটাই সেই বস্তু যা তোমাদের রাসূল তোমাদের জন্য রেখে গেছেন। কুরআন তোমার জন্য সুপারিশকারী। কুরআন তোমার জন্য অনুসরণীয়। কুরআন এমন এক সাক্ষী যার সাক্ষ্য নিয়ে কারও কোনো আপত্তি থাকবে না। এতে তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের আলোচনা আছে। তোমাদের জীবনের যাবতীয় বিষয়ের সমাধান আছে। এখন যা হচ্ছে এবং সামনে যা হবে তার সবই কুরআনে আছে।(সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ১/৩৯২)

তাই আমরা যদি আমাদেরকে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গড়তে চাই, আমাদের হারানো সেই গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়কে সমাজে প্রতিষ্টিত করতে চাই, তাহলে প্রতিটি মুমিনের সিনাকে কুরআনের জমিন বানিয়ে প্রতিদিন মালির মতো যত্নের সাথে গড়ে তুলতে হবে কুরআনের বাগান। যেই বাগানে ভ্রমর হয়ে মধু সংগ্রহের লিস্পায় মুমিন এতোটাই নিমগ্ন থাকবে যে দুনিয়ার মোহ, দুনিয়ার প্রতি অনুরাগ, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত, গোনাহের বেড়াজাল থেকে সে বের হয়ে আসতে পারবে। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বিদায় হজের ভাষণে ইরশাদ করেছেন, 'আমি

তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতদিন এ দুইটি বস্তু আকড়ে রাখবে ততদিন তোমরা পথ হারাবে না ১.আল্লাহর কিতাব এবং ২. আমার সুন্নাত

(সহীহ মুসলিম : ১২১৮; সহীহ ইবনে হিব্বান : ৬৫৬৪; সুনানে আবুদাউদ : ১৯০৫; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩০৭৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১৪৭০৫)

অতএব আমাদের সংশোধন কুরআনকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে। ইমাম মালেক রহ: কতই-না চমৎকার বলেছেন :

لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. 'এই উম্মতের প্রথম প্রজন্মের যেভাবে সংশোধন হয়েছে সর্বশেষ প্রজন্মের সংশোধন এভাবেই হবে। অর্থ্যাৎ সাহাবায়ে কেরমারা যেভাবে কুরআন কে আঁকড়ে ধরে সংশোধন হয়েছে আমাদের সংশোধন ও এভাবেই হবে।

প্রিয় নবী ﷺ এর জীবনীতে কুরআনের ভূমিকা

জাহিলিয়াতের বর্বরতার যুগে যখন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার রীতি ছিলো, নিচু ঘরের একজন নারীকে মা হতে একাধিক পুরুষের সঙ্গী হওয়া লাগতো ঠিক সেই যুগে সেই সমাজে আলোর বার্তা হিসেবে আল্লাহ ﷻ তার সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব মুহাম্মদ রাসূল ﷺ কে প্রেরণ করেন। এবং আল্লাহ ﷻ নবী ﷺ এর নবুয়াতের পর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় , সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব "আল কুরআন"। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআন মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলেন -

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الاحزاب: ٢١]

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

অতএব আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে মদিনার হাবীব মুহাম্মদ রাসূল ﷺ কে অনুসরণ করবো।

আর নবিজী ﷺ কেমন ছিলেন? তাঁর আদর্শ রীতিনীতি কেমন ছিলো? এই জন্য শুধু একটি হাদিসই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

হজরত ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.–এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূল ﷺ –এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর চরিত্র ছিল কোরআন। তারপর বলেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পড়ো না ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বলেন, পড়ো, তখন আমি পড়লাম,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ

'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ; যারা বিনয়–নম্র নিজেদের সালাতে; যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে; যারা জাকাত দানে সক্রিয়; যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।'

তারপর হজরত আয়েশা রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর চরিত্র এমনই ছিল। (আখলাকুন নবী)

আরেক হাদিসে আয়েশা (রা.)-কে নবীজির চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'জেনে রাখো! পুরো কোরআনই হলো রাসুল (সা.)-এর চরিত্র।' অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল-কোরআনের বাস্তব নমুনা। (মুসনাদ আহমদ: ২৫৮১৩)

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর রাসূল ﷺ তিনি কতোটা গভীর ভাবে আল্লাহর কুরআন কে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছেন, যে তাঁকে জীবন্ত কুরআন বলে আখ্যায়িত করা হতো। নবিজি তিনি কুরআন কে এমন ভাবে তাদাব্বুর করতেন যে কিছু সূরা তাঁকে বৃদ্ধ করে দেন।

আবু জুহাইফা এবং অন্যান্য (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) দ্বারা বর্ণিত (তিরমিযী এবং অন্যান্য জায়গায়) এই হাদিসে এসেছে যে, একদিন আবু বাকর (রাঃ) নবী (সাঃ) এর কাছে আসলেন এবং বললেন যে তাকে (নবী (সাঃ)) বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। সুনির্দিষ্ট শব্দটি ছিল 'শাইব' যা এমন অবস্থাকে বোঝায় যখন কারো চুল ধূসর ও সাদা হয়ে যায়। এই বর্ণনা থেকে সাহাবীদের ভেতরের অবস্থা বোঝা যায় যে, তারা কিভাবে নবী (সাঃ) এর সূক্ষ থেকে সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়ের দিকেও খেয়াল রাখতেন। তারা শুধুমাত্র তার কথা এবং কাজকেই আত্মস্থ করেননি, বরং তারা তার সূক্ষাতিসূক্ষ পরিবর্তনের দিকেও নজর রাখতেন। এই পর্যবেক্ষণের আশ্চর্যজনক দিক হলো, নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর সময় তার ২০টির বেশি চুল ও দাঁড়ি পাকা ছিলনা (বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত)। অথচ এই সামান্য কয়টি সাদা চুলও (সাহাবীদের) নজর এড়াতে পারেনি।

আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো যে আবু বাকর (রাঃ) এর এই কথাটি ছিল খুবই মামুলি একটি উক্তি। আমরা এধরণের কথা হর-হামেশাই আমাদের পরিবার-পরিজন, বন্ধু বান্ধবদের বলে থাকি, বিশেষত দীর্ঘদিন পর সাক্ষাত হলে। আমরা তাদের নিয়ে মশকরা করি যে তারা বুড়ো হয়ে গেছে, তাদের মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, তারা মোটা অথবা চিকন হয়ে গেছে ইত্যাদি। উত্তরে সাধারণত সেই বন্ধু জবাব দিবে কী কারণে তাদেরকে বুড়ো কিংবা ভিন্নরকম দেখাচ্ছে। হয়ত সে কাজের চাপে জর্জরিত,

অথবা তার শারীরিক কোন সমস্যা রয়েছে কিংবা তার স্ত্রী-সন্তানদের কারণে তার ওপর ধকল যাচ্ছে।

কিন্তু নবী (সাঃ) এর জবাব এমনটি ছিলনা। আমরা যদি নিষ্ঠার সাথে চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাবো যে তার জীবনে কত ধরণের চাপ যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে একজন স্বামী, পিতা, বন্ধু, ইমাম, নেতা এবং সেনাপতি। অর্থাৎ, সবকিছুর দায়ভার তার উপরেই ন্যস্ত ছিল। তাকে জুমার খুতবা প্রস্তুত করতে হত, সালাতের ইমামতি করতে হত, লোকজনের নানবিধ বাক-বিতন্ডার সমাধা করতে হত। এরপর তিনি ঘরে ফিরে আসতেন ও নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করতেন, নাতিদের সাথে খেলাধুলা করতেন এবং নিজের মেয়েদের সাথে কৌতুক করতেন। তিনি বৃদ্ধ ও অসুস্থদের দেখতে যেতেন, নিজের বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতেন এবং দরিদ্রদের খাবার খাওয়াতেন। এরপর তাকে কুরাইশ এবং অন্যান্য শত্রুদের মোকাবেলায় নিজের বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে হত, সেসময়কার রাজনৈতিক বিষয়গুলো সামলানো সহ আরো অগণিত কাজ করতে হত।

কিন্তু এতোকিছুর কোনোটিই তার বৃদ্ধ হয়ে যাবার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং নবী (সাঃ) জবাব দিলেন, "সূরা হুদ এবং তার বোনেরা (অনুরূপ সূরাগুলো) আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে"। আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, নবী (সাঃ) সবগুলো সূরার নাম উল্লেখ করে বলেন, "সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, নাবা এবং তাকউয়ির আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে" ২

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়,

কুরআনকে শুধু তিলওয়াতে সীমাবদ্ধ করা,অথবা তাঁর সাথে ভাসা ভাসা সম্পর্ক করা চলবেনা। এর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র একটি অনুপ্রেরণামূলক বয়ান কিংবা সুন্দর তেলাওয়াত শোনাতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবেনা। কুরআনের দাবি এই যে, আমরা এর বাণীকে অন্তরে ধারণ করবো এবং আমাদের শরীরের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করবো। আমাদের সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবন সর্বত্র কুরআনের ছাপ থাকতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ জীবনী থেকে জানা যায় যে তিনি অসংখ্যবার

কালামুল্লাহর তিলওয়াতে কেঁদেছেন, আল্লাহর দরবারে দুআ করেছেন । আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ..... ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ)-কে বললেনঃ তুমি আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ) বললেন- আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাব? অথচ কুরআন তো আপনার প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেনঃ আমি অন্যের মুখ থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালবাসি। হাদীস বর্ণনাকারী ইবরাহীম বলেনঃ অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ) সূরাহ্ আন নিসার প্রথম থেকে

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا "হে নবী! একটু ভেবে দেখুন তো সে সময় এরা কী করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব, আর এসব লোকের জন্য আপনাকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করব"— (সূরাহ আন নিসা ৪ঃ ৪১) এ আয়াত পর্যন্ত তাকে পড়ে শুনালেন। এতে নবীজি ﷺ কেঁদে ফেললেন। (মুসলিম হাদিস ১৭৫৪)

প্রিয় নবী ﷺ রবের সেই আয়াতের যেনো প্রত্যক্ষ উদাহরণ -

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِیۡنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ وَ اِذَا تُلِیَتۡ عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتُهٗ زَادَتۡهُمۡ اِیۡمَانًا وَّ عَلٰی رَبِّهِمۡ یَتَوَکَّلُوۡنَ ۚ﴿۲﴾

মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল আয়াত:৮)

আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়-

আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) কোরআনে ইবরাহিম (আ.)-এর দোয়াসংবলিত আয়াত,

‘رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم٣٦

হে আমার রব, এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’ (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৬) পাঠ করেন।

আর ঈসা (আ.) বলেছেন

اِنۡ تُعَذِّبۡهُمۡ فَاِنَّهُمۡ عِبَادُکَ ۚ وَ اِنۡ تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَاِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ﴿۱۱۸﴾

‘তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তাহলে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করো, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সুরা : আল মায়েদা, আয়াত : **১১৮**) পাঠ করেন।

তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত উঠালেন এবং বলেন, হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেলেন। তখন মহান আল্লাহ বলেন, হে জিবরাইল, মুহাম্মদের কাছে যাও, তোমার রব তো সবই জানেন-তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কাঁদছেন কেন? জিবরাইল (আ.) এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) যা বলেছিলেন, তা তাঁকে অবহিত করলেন।

আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, হে জিবরিইল, তুমি মুহাম্মদের কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।’ (মুসলিম, হাদিস : ৩৮৭)

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বোত্তম চরিত্রবান মনিষী রাসূল ﷺ কুরআন তিলওয়াত করতে কিংবা শুনতে গিয়ে এভাবেই বারংবার ভেঙে পড়তেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারক ভিজে যেতো অনুতাপের জলে, কৃতজ্ঞতার জলে, কখনো বা জাহান্নামের ভয়ে। তাঁর পুরো জিন্দেগী ব্যয় হয়েছে কিতাবুল্লাহর দাওয়াহ, এর হিকমাহ, প্রঞ্গা, এর আদেশ ও নির্দেশ পালন

করে। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম, তিনি ছিলেন মহামানব, তিনি ছিলেন পূত পবিত্র, তিনি ছিলেন গোনাহ মুক্ত কিন্তু এরপর ও জাহান্নামের আয়াতগুলোতে তিনি কাঁদতেন। তিনি সালাতরত অবস্থায় এমনভাবে কাঁদতেন যেনো তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

قَالَ: أَتَيْتُرَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে চুলার হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল।' (আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে, শামায়েলে তিরমিযী বিশুদ্ধ সূত্রে) নাসায়ী **১২১৪**

অর্থ্যাৎ কুরআনুল কারীমের চিন্তা, তাঁর প্রভাব,রবের ভয়ে তিনি সালাতে যখন তিলওয়াত করতেন, তাঁর হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হতো এবং ক্রমাগত তিনি ক্রন্দন করতেন।

কিতাব হলো নবীদের সবচেয়ে বড়ো প্রমান, সবচেয়ে বড়ো দলিল। এই কুরআনের বদৌলতে আল্লাহ কতেক জাতিকে সম্মান করেছে আর কতেক জাতিকে লাঞ্ছিত করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন -

ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرين

"এই কুরআনের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা একটি জাতিকে সমুন্নত করেন আবার অন্য জাতিকে পর্যুদস্ত করেন**"** [আস-সহীহ,মুসলিম ৮১৭]

আল্লাহ রাসূল ﷺ ঠিক যেইভাবে তাঁর জীবনে কুরআনকে মাথার তাজ হিসেবে নিয়েছে তাঁর অনুসারী পৃথিবীর নক্ষত্রগন রাদিআল্লাহু আনহুম ও ঠিক একইভাবে কুরআনকে তাদের মাথার মুকুট হিসেবে মেনেছিলো, তাদের জিহ্বা, হাত,পা সমস্ত অঙ্গ সর্বদা প্রস্তুত থাকতো রবের কিতাব তিলওয়াত ও আমলিয়াতের জন্য । আর তাদের

অনুসারী হিসেবে আমাদের জীবনে ও কুরআনের ভূমিকা ঠিক এই পর্যায় থাকা চাই। বস্তুবাদী সমাজে কুরআন কে কেবল একটি ধর্মীয় কিতাব হিসেবে বুক শেল্ফে সাজিয়ে রাখা, আবেগের সাথে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অন্যান ধর্মালম্বীর কিতাবের সাথে তিলওয়াত করা আর মুসলমান পরিচয় ধরে রাখতে সূরা ফাতিহা অব্দি শিখে রাখা। এইভাবে কিতাবুল্লাহ কে ছোট করবেন না । মুমিনের কুরআনের সাথে এই ধরণের সম্পর্ক হতে পারেনা, বরং মুনাফিকরাই কুরআনের সাথে এমন আচরণ করে।

সাহাবি আজমাইদের জীবনীতে কুরআনের ভূমিকা

কোরআনি শিক্ষা তখনকার আরবদের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটায়, তার সামান্য আঁচ পাওয়া যায় শাহেনশাহ ইয়াজিদগির্দের জবানিতে— কবি ফেরদৌসি যা এভাবে বর্ণনা করেন

زشیر شتر و سوسمار
عرب را بجائے رسیداست کار
کہ تخت کیاں را کنند آرزو
تفو بر تو اے چرخ گردوں تفو

'উটের দুধ আর গুইসাপ খেকো আরবরা এখন সিংহাসন খুঁজছে? লজ্জা লজ্জা, কী গজব কাণ্ড ঘটাইলি তুই ওরে আসমান!'

কুরআনের ইল্‌ম ওই উট চড়ানো আরববাসীকে এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অলঙ্কৃত করেছে যে, শুধু পারস্য, রোমান, আন্দালুসিয়া নয় প্রায় গোটা দুনিয়া তারা কব্জা করে নিয়েছিলেন। এই জন্যই আল্লামা ইকবাল তাঁর শায়েরীতে বলেন-

کبھی اے نوجواں مسلم!
تدبّر بھی کِیا تُو نے

وہ کیا گرِدُوں تھا تُو
جس کا ہے اک ٹُوٹا ہوا تارا

কখনো হে মুসলিম যুবক! ভেবে দেখেছ কি তুমি,

আসমানের ঝরে পড়া সে তারাগুলোর তুমিও একটি ছিলে।

ہے آغوشِ محبّت میں

کُچل ڈالا تھا جس نے
پاؤں میں تاجِ سرِ دارا

ভালোবাসার আঁচলে তোমাকে বড় করেছিল এক জাতি,

যারা অবজ্ঞা ভরে পায়ে মাড়িয়েছিল পারস্যের মুকুটকে।

تمدّن آفریں، خلاّقِ
آئینِ جہاں داری

وہ صحرائے عرب یعنی
شتربانوں کا گہوارا

সভ্যতার বীজ বুনে পৃথিবীর আইন যারা করেছিল তৈরী,

যুবক! আমি তোমায় আরব মরুভূমির সে মেষচালকদের কথা বলছি।

سماں 'الفُقْرُ و

فَخرْی' کا رہا شانِ امارت میں

"بآب و رنگ و

خال و خط چہ حاجت رُوے زیبا را"

বাদশাহীতেও যাদের ছিল দারিদ্র্যের আলিশান ছাপ

সুদর্শন সে অবয়বে প্রসাধনীর আর কীইবা দরকার!?

والے تھے غیور اتنے

کہ مُنعم کو گدا کے ڈر
سے بخشش کا نہ تھا یارا

অভাবেও ছিলেন তারা এমন মর্যাদাবোধ সম্পন্ন

অভাবীর প্রতাপে ধনীর ছিলনা দান-দক্ষিণার সাহস

غرض مَیں کیا کہُوں
تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے

جہاں‌گیر و جہاں‌دار و
جہاں‌بان و جہاں‌آرا

যাক! কেমন ছিল সে মরুবাসীরা, কিভাবে যে তোমায় বলি

তারা ছিল বিশ্বজয়ী – প্রতাপশালী, এই পৃথিবীর রক্ষক ও মালি

اگر چاہوں تو نقشہ
کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں

مگر تیرے تخیّل سے
فزوں تر ہے وہ نظّارا

সে দৃশ্যকে চাইলে শব্দের বুননে এঁকে দেখাতে পারি

কিন্তু তোমার কল্পনা যে তা ধারণ করতেও অক্ষম

تجھے آبا سے اپنے کوئی
نسبت ہو نہیں سکتی

کہ تُو گُفتار وہ
کردار، تُو ثابت وہ سیّارا

পুর্বপুরুষের সাথে তোমার সম্পর্ক হতেই তো পারেনা

তুমি বাচাল তারা তৎপর, তুমি অলস তারা কর্মঠ

گنوا دی ہم نے جو
اسلاف سے میراث پائی تھی

ثُریّا سے زمیں پر
آسماں نے ہم کو دے مارا

পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া আমানতকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি

যদ্দরুন আসমান থেকে পাতালপুরীতে এসে নিক্ষিপ্ত হয়েছি

পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া আমানত কুরআনকে, কুরআনের শিক্ষা কে, বাস্তবিক ভাবে পুরো দমে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এই জন্য আজ আমাদের অবস্থা সবচেয়ে হীনমন্য জাতি হিসেবে,মার খাওয়া জাতি হিসেবে, আরাকান থেকে উইঘুর, কাশ্মীর থেকে ফিলিস্তিন উম্মাহর সন্তানরা কাঁদছে, একজন উমরের জন্য, একজন সালাউদ্দিন আইয়ুবের জন্য, একজন মেহেদী আ: এর জন্য । এ যেনো রাসূল ﷺ সেই হাদীসের বাস্তব প্রমান

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ‘শিগগির মানুষ তোমাদের আক্রমণ করার জন্য একে অপরকে আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সঙ্গে খাবার খাওয়ার জন্য একে অপরকে আহ্বান করে।’ জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল! তখন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকবো।’ তিনি বললেন, ‘না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত। কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সমুদ্রের স্রোত বয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহান ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।’ জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আল-ওয়াহান কি?’ রাসুল (সা.) বলেন, ‘আল-ওয়াহান হলো- দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৭৫৩৯)

আর সাহাবিদের জিন্দেগীতে তাকালে দেখা যায় আল্লাহ তাআ'লার বিধিবিধান বাস্তবায়নে সময় ও ধনসম্পদ তো বটেই, এমনকি হাসিমুখে জীবন দিয়ে দেওয়াকে পর্যন্ত ফরজ করে নিয়েছিল।

হজরত খুবায়ব (রা)এর ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে বুখারি ও আবু দাউদ শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে— খুবায়বকে যখন হারিস ইবন আমের ইবন নওফেলের ছেলে শহীদ করে, তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا
عَلَى أي شِقٍّ كَانَ لله مَصْرَعِي
وَذَلِكَ في ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ
يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو مُمَزَّعِ

'আমাকে কতল করা হচ্ছে আর আমি মুসলমান, কোনো ভয় নেই, কারণ আল্লাহর পথেই আমার রক্ত ঝরবে। আর যিনি আল্লাহর পথের মুসাফির, আল্লাহ চাইলে তার টুকরো টুকরো শরীরও আরও চমকদার (বরকতময়) করে জোড়া লাগাতে পারবেন।'৩

সাহাবী আজমাইনরা কোথা থেকে এই শক্তি, এই ত্যাগের উৎসাহ পেয়েছে? কে তাদেরকে গাইরুল্লাহর ভয়কে দূরে ঠেলে দিয়ে বিশ্বনিখিলের একমাত্র রব আল্লাহ ﷻ ভয় করতে শিখিয়েছে। অথচ তাঁরা ছিলো এমন জাতি, যাঁরা প্রভাতে খেজুর দিয়ে মূর্তি বানাতো আর নৈশ্যভোজে সেই খেজুরেই আহার করতো।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, আবু রাজা আলউতারিদী রা. বলেন-

كُنّا نَعْبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ، وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمّ جِئْنَا بِالشّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمّ طُفْنَا بِهِ.

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা কোনো একটি পাথরের পূজা করতাম। কখনো এরচে উত্তম কোনো পাথর পেয়ে গেলে এটিকে ফেলে দিয়ে অন্যটির পূজা আরম্ভ করতাম। কখনো যদি পাথর না পেতাম কিছু মাটি একত্রিত করে স্তুপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বকরি এনে সেই স্তুপের উপর দুধ দোহন করতাম। এরপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম। (হাদীস ৪৩৭৬)

ইবনে হাজার রাহ. ফাতহুল বারীতে (১০/৩৮৪) কুরতুবী রাহ.-এর সূত্রে উল্লেখ করেন, জাহেলী যুগের লোকেরা যে কোনো কিছু দিয়ে মূর্তি বানাত। এমনকি তাদের কেউ কেউ খেজুর দিয়ে মূর্তি বানাত। ক্ষুধা লাগলে সেই মূর্তিকেই আবার খেয়ে ফেলত।

চিন্তা করেন এমন এক জাতিকে কালামুল্লাহ কিভাবে পরিবর্তন করে ফেলে! আসলে তাঁরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরেছে, কিতাবুল্লাহর প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সীরাত ও হাদীসে এর অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা আছে।   মদ পান খাওয়া হারাম উক্ত আয়াত নাযিলের ঘটনাটি দেখুন।

জাহেলিয়াতের যুগে , আরবরা ছিলো মদের প্রেমিক। অতিথি আপ্যায়নসহ কোনো অনুষ্ঠান মদ পরিবেশন ছাড়া তারা চিন্তাও করতে পারতো না। ঘরে ঘরে বিভিন্ন ধরনের মদ তৈরি হতো। তার ধারাবাহিকতায় সাহাবায়ে কেরামও (রা.) মদ পান করতেন। এক অনুষ্ঠানে কিছু সাহাবা মদ পান করছিলেন এক একজন এক এক অবস্থায় ছিলেন। কেউ খাচ্ছিলেন, কেউ ঢালছিলেন, কেউ ঠোঁটের সঙ্গে গ্লাসটি লাগাচ্ছেন এমন সময় ঘোষণাকারী ঘোষণা করল মদকে হারাম করে আয়াত নাজিল হয়েছে। অমনি যে যার অবস্থায় থেমে গেলেন। যিনি মুখে নিয়েছেন তিনি কুলির মতো করে ফেলে দিলেন এক ঢোকও পান করলেন না। যিনি গ্লাস ঠোঁটে ছুঁইয়েছেন তিনি তা নামিয়ে ফেললেন। যার যার ঘরে যত মদ ছিল শুধু ওই একটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় সব মদ ছুড়ে ফেলে দেয়া হল। মদিনার অলি-গলি এমনভাবে ভিজে গেল যেন মদ বৃষ্টি হল। (৪)

অথচ বিশ্বের মানুষের কাছে গড ফাদার নামে খ্যাত আমেরিকা এই মদকে হারাম করতে বছরের পর বছর ধরে মদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। এর অপকারিতা বিবৃত ও বিজ্ঞপিত করার কাজে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, সংখ্যাতাত্বিক প্রমাণ এবং যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তার শারীরিক, নৈতিক ও আর্থিক অনিষ্টকারীতাকে এমনিভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ছবির সাহায্যে মদের অপকারিতাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। জনসাধারণ যাতে নিজেরাই মদের অনিষ্টকারীতা বুঝতে পেরে তা বর্জন করতে প্রস্তুত হয়, সর্বোতভাবে তার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া জাতির সবচাইতে বড় প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা Congress বিপুল ভোটাধিক্যে মদ্য নিবারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় আইনও পাশ করে। সর্বোপরি তার কেনাবেচা, চোরাই-প্রস্তুতি ও আমদানি-রপ্তানিকে বন্ধ করার জন্যে সরকার (যে সরকার তৎকালীন দুনিয়ার বৃহত্তম

শক্তিবর্গের অন্যতম) তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে। কিন্তু জাতি (যে জাতি তখনকার শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত জাতিগুলোর অগ্রনায়ক ছিলো) তাকে বর্জন করতে সম্মত হয়নি। অবশেষে চৌদ্দ–পনের বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তারা হারামকে আবার হালাল করতে বাধ্য হয়ে গেলো।

অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রে মদের বিরুদ্ধে কোন প্রচারণা চালানো হয়নি। সেখানে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা বাবদ একটি পয়সাও ব্যয়িত হয়নি। কোন ‘এ্যান্টি সেলুন লীগ’-ও গঠন করা হয়নি। সেখানে আল্লাহ্‌র রসূল কেবল এইটুকু বলে দিয়েছেন যে, ‘আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য মদকে হারাম করে দিয়েছেন।’ তাঁর মুখ থেকে এই নির্দেশটি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা জাতি (যে জাতি মদের প্রেমে আমেরিকার চাইতেও বেশি অগ্রবর্তী ছিলো এবং পারিভাষিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় কেউ তার সমকক্ষ ছিলোনা) সুরাপান থেকে বিরত হলো। তারা মদকে এমনিভাবে বর্জন করল যে, ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে তাদের পক্ষে ‘রসহীনতা’ থেকে ‘রসসমুদ্রে’ প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব হয়ে গেলো। পরন্তু এই ‘রসহীনতা’র মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্যে তাদের কোন অনুশাসন, কোন জিজ্ঞাসাবাদ বা কোন দণ্ডবিধিরও প্রয়োজন রইলোনা। কারণ কোন জবরদস্তি শক্তি বর্তমান না থাকলেও তারা সুরাপান থেকে বিরত থাকবে। (৫) কেবল আল্লাহর বিধান,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

অর্থঃ ‘হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, পাশাখেলা ইত্যাদি হচ্ছে শয়তানের উদ্ভাবিত নোংরা কাজ; সুতরাং ওগুলো তোমরা বর্জন করো। আশা করা যায়, এই বর্জনের ফলে তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বৈরিতা জাগিয়ে তুলতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখতে চায়। এটা জানার পরও কি তোমরা ওগুলো থেকে বিরত থাকবেনা? আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের কথা শোনো এবং বিরত থাকো। কিন্তু তোমরা যদি অবাধ্যতা

করো, তবে জেনে রেখো, আমার রসূলের কাজ হচ্ছে শুধু নির্দেশকে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।' (সূরা মায়িদা: ৯০-৯১)

যেই জাতি মদের প্রেমিক ছিলো,শরাব দিয়ে তাঁরা গোসল করতো, তাদের ভাষায় মদের প্রায় আড়াইশোর ও বেশি নাম আছে।এটা ছিলো মদের প্রতি তাদের আসক্তির প্রমাণ। এর আরও একটি প্রমাণ হচ্ছে তাদের কাব্য সাহিত্য। তা থেকে জানা যায়, মদ্যপান ছিলো তাদের স্বভাবগত এবং তা বিবেচিত হতো তাদের জীবনধারণের পক্ষে একটি অপরিহার্য বস্তু হিসেবে সেই জাতি এক নিমিষে মদ ছেড়ে দিলো। ছেড়ে দিলো নিজেদের ঐতিহ্য। আলিঙ্গন করে নিলো কুরআনের আয়াতকে, বুকে জায়গা করে দিলো কুরআনের প্রতিটি আদেশ নিষেধকে

সাহাবী আজমাইনরা কীভাবে কুরআনকে আমল করতেন

কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর নাযিলকৃত প্রত্যাদেশ। এতে আমাদের জন্য হিদায়াত ও নূর, পথনির্দেশ রয়েছে। মূলত কুরআন নাযিল হয়েছে এই কারণে যে যাতে আমরা তা পড়ি, এবং অনুধাবন করি আর আমলে পরিণত করি। সাহাবায়ে কেরামরা মূলত কুরআন শেখা বলতে এটাকে হিফজ করতেন, এর ভেতরকার কথামালাকে বোঝা তা নিয়ে ভাবা ও একে আমলে পরিণত করতেন। এই জন্য দেখা যেতো কোনো কোনো সাহাবীর সূরা বাকারা হিফজ করতেই ১ বছর লেগে যেতো। মালেক রহিমাহুল্লাহু বলেন ইবনে উমর রা: আনহুর বারো বছর লেগেছিলো সূরা বাকারা শিখতে। যখন তিনি সূরা বাকারা খতম করেন তখন একটি উট জবাই করেন।আর এ সময় তিনি শুধু সূরাটি মুখস্থ বা এর শাব্দিক অর্থ আত্যস্থ করায় ব্যস্ত থাকেন নি বরং ধারণা করা যায় তাঁরা তো পরবর্তীতে চেয়ে দ্রুতই মুখস্থ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তাদাব্বুর করতেন। এই আসমানী মহা বাণীতে তাদের জন্য কী বার্তা রয়েছে, কী মর্ম ও বিধান রয়েছে তা অনুধাবন ও আমলে সময় ব্যয় করতেন। এই জন্যই সাহাবারা কথা কম বলতেন কিন্তু তা বরকতে বেশি হতো। অপরদিকে পরবর্তী যুগের মানুষরা কথা বেশি বলতেন কিন্তু বরকত কম হতো। কেননা সাহাবারা সর্বদা কুরআনের হক আদায় করতেন। ফলে তাদের সামান্য নসিহা কিংবা বাক্যবলিতে ও তত্ত্ব, মর্ম, চিন্তা, বিদগ্ধতার নির্যাস থাকতো। কোনো কোনো সাহাবারা কুরআনের একটি আয়াত তিলওয়াতের মাধ্যমে পুরো রাত কাটিয়ে দিতো। এটা ছিলো আমাদের নবীর একটি সুন্নাহ। যেটা সাহাবী আজমাইনরা ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।(৬)

আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “উসমান ইবন আফ্ফান, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ প্রমুখ যারা আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তারা বলেছেন, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশটি আয়াত শিখতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভালোভাবে না শিখতেন ও তাতে যে সকল জ্ঞান ও আমল করার কথা রয়েছে তা বাস্তবায়ণ না করতেন ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতেন না। তারা বলেন, আমরা এভাবেই কুরআন, জ্ঞান ও আমল সবই শিখেছি।” [মাজমূ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ৭/১৬৮, মালিক ফাহাদ প্রেস]

সাহাবিদের আরেকটি আমল ছিলো, তিলওয়াতের মাঝে গভীর ভাবে তাদাব্বুর করা। যেনো আয়াতটি ইতোপূর্বে তাঁরা পড়েনি। আশ্চার্যনিত হয়ে একটি আয়াত বারবার আওড়াতেন, হাদিস থেকে এমন অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায়।

তামীম দারী রা. একটা আয়াত পড়তে পড়তে পুরো রাত কাটিয়ে দিয়েছেন;

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

যারা অসৎ কার্যাবলীতে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি ভেবেছে আমি তাদেরকে সেই সকল লোকের সম গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, ফলে তাদের জীবন ও মরণ একই রকম হয়ে যাবে? তারা যা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা কতই না মন্দ (জাসিয়া: ২১)।

— — সালাফদের অভ্যেসই ছিল এমন। তারা একটি আয়াত নিয়ে রাত ভোর করে দিতেন।

তাবেয়ীদের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

তাবেয়ীদের জীবনে কুরআনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূলভিত্তি। তাঁরা সাহাবীদের কাছ থেকে কুরআন ও ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তা নিজেদের জীবনে গভীরভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তাবেয়ীদের জীবনে কুরআনের ভূমিকা বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ পায়:

১. শিক্ষার মূল উৎস:তাবেয়ীরা কুরআনকে তাঁদের শিক্ষার মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কুরআনের আয়াত মুখস্থ করতেন, তেলাওয়াত করতেন এবং এর অর্থ ও তাফসির নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতেন।

২. আমল ও আচরণে প্রতিফলন:তাঁরা কুরআনের নির্দেশাবলী মেনে চলতেন এবং তা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। কুরআনের নীতিগুলো তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণে প্রতিফলিত হতো।

৩. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি:তাবেয়ীরা কুরআন থেকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করতেন। কুরআনের শিক্ষা তাঁদের চরিত্র গঠনে সহায়ক ছিল এবং তাঁদেরকে উন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল।

৪. সামাজিক বিচার ও ন্যায়বিচার:তাঁরা কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক বিচার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতেন। কুরআনের আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁরা একটি ন্যায়পরায়ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালাতেন।

৫. কুরআনের প্রচার ও শিক্ষা:তাবেয়ীরা কুরআনের শিক্ষা ও তাফসির অন্যদের মধ্যে প্রচার করতেন। তাঁরা মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং মানুষের মধ্যে কুরআনের গুরুত্ব ও প্রভাব ছড়িয়ে দিতেন।

৬. কুরআনের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা:তাঁরা কুরআনের প্রতি গভীর সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। কুরআন তাঁদের জীবনের অমূল্য সম্পদ ছিল এবং তাঁরা সবসময় কুরআনের আদব ও মর্যাদা রক্ষা করতেন।

৭. সমস্যা সমাধানে কুরআন:তাবেয়ীরা জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করতেন। তাঁরা কুরআনের আয়াত থেকে সমস্যার সমাধান খুঁজতেন এবং তা অনুযায়ী কাজ করতেন।তাবেয়ীদের জীবনে কুরআনের এই ভূমিকা আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁদের মতো আমরা যদি কুরআনকে আমাদের জীবনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করি এবং এর নির্দেশনা মেনে চলি, তাহলে আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারি।

তাবেয়ীদের জীবনে কুরআনের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হলো, যা তাঁদের কুরআনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণে তাদের দৃঢ়তার প্রমাণ দেয়:

১. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) ও কুরআনের আমল:সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) ছিলেন বিখ্যাত তাবেয়ী এবং একজন বিশিষ্ট মুফাসসির। তিনি কুরআনের আয়াতের উপর গভীর চিন্তা করতেন এবং তা অনুযায়ী আমল করতেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কেন এত বেশি কুরআন তেলাওয়াত করেন?" তিনি উত্তর দেন, "কুরআন আমার জন্য আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যম।"

২. উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহ.) ও কুরআনের শিক্ষা:উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং বিখ্যাত সাহাবী আবু বকর (রা.)-এর নাতি। তিনি

কুরআনের শিক্ষা নিয়ে গভীর গবেষণা করতেন এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচার করতেন। একবার তাঁর পা কেটে ফেলতে হয়েছিল, তখনও তিনি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা শান্তি পাচ্ছিলেন।

৩. হাসান আল-বাসরি (রহ.) ও কুরআনের প্রভাব:হাসান আল-বাসরি (রহ.) ছিলেন বিখ্যাত তাবেয়ী এবং অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁর জীবনে কুরআনের প্রভাব ছিল ব্যাপক। একবার তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন কোনো জিনিস দেখতে পাই না যা মানুষের হৃদয়কে কুরআনের মতো মোলায়েম করে।" তিনি কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা করতেন এবং তা অনুসারে তাঁর জীবনযাত্রা পরিচালনা করতেন।

৪. আলকামা ইবনে কায়েস (রহ.) ও কুরআনের প্রতি ভালোবাসা:আলকামা ইবনে কায়েস (রহ.) ছিলেন ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রধান ছাত্র। তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং তা মুখস্থ করতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কুরআনের এত বেশি আয়াত কিভাবে মুখস্থ করেছেন?" তিনি উত্তর দেন, "আমি প্রতিদিন নিয়মিত তেলাওয়াত করি এবং আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চাই।"

৫. আতাআ ইবনে আবি রাবাহ (রহ.) ও কুরআনের হিদায়াত:আতাআ ইবনে আবি রাবাহ (রহ.) ছিলেন বিখ্যাত তাবেয়ী এবং একজন প্রতিভাবান মুফতি। তিনি বলতেন, "কুরআন হচ্ছে মানুষের হিদায়াতের উৎস। আমি কুরআন থেকে যা শিখি, তা আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি।"এই ঘটনাগুলো তাবেয়ীদের জীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও তাঁদের কুরআনের প্রতি গভীর মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনের উদাহরণ। তাঁদের জীবন ও কাজ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা, যা আমাদের কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণে সাহায্য করবে।

৬. রাবী ইবনে খুথায়ম (রহ.) ও কুরআনের গভীর চিন্তা:

রাবী ইবনে খুথায়ম (রহ.) ছিলেন তাবেয়ীদের মধ্যে একজন বিখ্যাত আলেম। তিনি কুরআনের আয়াতের উপর গভীর চিন্তা করতেন এবং তা অনুযায়ী আমল করতেন। একবার তাঁকে দেখা গেল, তিনি কুরআনের একটি আয়াতের উপর দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করছেন এবং কান্নাকাটি করছেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন, "কুরআনের এই আয়াত আমাকে আমার জীবনের প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয়।"

৭. তাওস ইবনে কাইসান (রহ.) ও কুরআনের আদব:

তাওস ইবনে কাইসান (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং কুরআনের তেলাওয়াত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিখ্যাত। তিনি কুরআন তেলাওয়াতের সময় সবসময় পবিত্রতা বজায় রাখতেন এবং সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করতেন। একবার তাঁকে দেখা গেল, তিনি তেলাওয়াত করতে করতে কাঁদছেন এবং বলছেন, "এই কুরআন আল্লাহর কথা, তাই আমি আমার সেরা চেষ্টা দিয়ে তা তেলাওয়াত করছি।"

৮. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহ.) ও কুরআনের শিক্ষা:

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী এবং মদিনার সাতজন বিখ্যাত ফকীহদের একজন। তিনি কুরআনের প্রতি গভীর সম্মান পোষণ করতেন এবং কুরআনের শিক্ষা প্রচারে নিরলস কাজ করতেন। একবার তাঁর এক ছাত্রকে বলেন, "যদি তুমি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করো এবং তা মেনে চল, তাহলে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে দয়া ও ক্ষমা পাবে।"

৯. মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.) ও কুরআনের অধ্যয়ন:

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.) ছিলেন একজন বিখ্যাত তাবেয়ী এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি কুরআন মুখস্থ করেছিলেন এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করতেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি কিভাবে কুরআনের এত বেশি আয়াত মনে রাখতে পারেন?" তিনি উত্তর দেন, "আমি প্রতিদিন নিয়মিত তেলাওয়াত করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যাতে তিনি আমাকে সাহায্য করেন।"

১০. উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) ও কুরআনের শাসন:

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) ছিলেন একজন খলিফা এবং তাবেয়ী। তিনি তাঁর শাসনামলে কুরআনের নির্দেশনা মেনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "কুরআনের শিক্ষা মেনে চলাই হলো সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।"

এই ঘটনাগুলো তাবেয়ীদের জীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও তাঁদের কুরআনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতিফলন। তাঁদের জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা, যা আমাদের কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করব (৭

কাফেরদের অন্তরে কুরআনের প্রভাব

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরব ভূখণ্ডে যেসব কাফির-মুশরিক ছিল, তারা কোরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কখনো তাকে কাব্য আবার কখনো তাকে জাদু আখ্যা দিয়েছিল। তবে আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে তাদের কাছে শৈল্পিক সৌন্দর্যের মাপকাঠি কী ছিল। অবশ্য এ কথা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি, তারা কোরআন দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল। কোনো সন্দেহ নেই, কোরআন অবতীর্ণের সময় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় শ্রেণির ওপর জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল।কেউ এই প্রভাবে মুসলিম হয়েছে আর কেউ তার স্পর্শ পেয়েও পালিয়ে গিয়েছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় শ্রেণি কোরআনের ব্যাপারে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাদের কেউ এটি চিহ্নিত করতে পারেনি যে কোরআনের ঠিক কোন অংশ তাদের প্রভাবিত করেছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘কুরআন শোনার পর আমার ভেতর ভাবান্তর হলো, আমি কাঁদতে লাগলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আমি বললাম, এ কথাগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাহাত্ম্য কত বেশি। ’

ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা কোরআন ও রাসুলুল্লাহ (সা.) উভয়কে অস্বীকার করেছে। সে তাঁর সঙ্গে মারাত্মক শত্রুতাও পোষণ করত। নবীজি (সা.)-এর এমন চরম শত্রুর মুখ থেকেও বের হয়েছিল, ‘আল্লাহর শপথ! কোরআনের মধ্যে মাধুর্য পাওয়া যায়। মনে হয়, এটি শাশ্বত এক বাণী। সব কিছুকে জয় করে নেয়। সবচেয়ে উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন কোনো কিছুও এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না। ’

সে আরো বলেছিল, ‘কোরআনের মধ্যে জাদুকরী প্রভাব আছে। তোমরা দেখো না তা কিভাবে একজন মানুষকে তার আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথিদের থেকে পৃথক করে দেয়?’

আর মুমিনের প্রতিক্রিয়া খোদ কোরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে,

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحۡسَنَ الۡحَدِیۡثِ کِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ ٭ۖ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُوۡدُ الَّذِیۡنَ یَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ۚ ثُمَّ تَلِیۡنُ جُلُوۡدُهُمۡ وَ قُلُوۡبُهُمۡ اِلٰی ذِکۡرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِکَ هُدَی اللّٰهِ یَهۡدِیۡ بِهٖ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ مَنۡ یُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنۡ هَاد٢٣﴿ ٍ

‘আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণীসংবলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্য ও যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গা রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। ’ (সুরা : জুমার, আয়াত : ২৩)

قُلۡ اٰمِنُوۡا بِهٖۤ اَوۡ لَا تُؤۡمِنُوۡا ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ مِنۡ قَبۡلِهٖۤ اِذَا یُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ یَخِرُّوۡنَ لِلۡاَذۡقَانِ سُجَّدًا ﴿۱۰۷﴾ۙ

وَّ یَقُوۡلُوۡنَ سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنۡ کَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُوۡلًا ﴿۱۰۸﴾

وَ یَخِرُّوۡنَ لِلۡاَذۡقَانِ یَبۡکُوۡنَ وَ یَزِیۡدُهُمۡ خُشُوۡعًا ﴾۱۰۹﴿

আহলে কিতাবদের ওপর কোরআন নাজিলের প্রতিক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ—বলো ‘যাদের এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়ে থাকে এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটি তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। ’ (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১০৭-১০৯)

অবশ্য কোরআনে সেসব মানুষের অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে, যারা কোরআন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরও তাদের হঠকারিতার ওপর অটল ছিল এবং অন্যদের কোরআন শ্রবণ করা থেকে বাধা দিত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা বলে,

وَ قَالُوۡۤا اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ اکۡتَتَبَهَا فَهِیَ تُمۡلٰی عَلَیۡهِ بُکۡرَۃً وَّ اَصِیۡلًا ﴿۵﴾

এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়। ' (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ৫) [৮]

তবে যুগে যুগে যারাই অন্তরে বক্রতাকে দূরে ঠেলে কুরআনের কাছে এসেছে তাঁরাই কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। পরিনত হয়েছে যিশু থেকে আবদুল্লাহ তে।

আমরা কেন কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হইনা!

কুরআন কেন আমাদের হৃদয় বিগলিত করে না, কেন সাহাবী আজমাইন ও তাবেয়ীদের মতো আমরা কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হইনা। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দেখতে হবে - কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ কিরূপ! সাহাবী আজমাইনরা কুরআনকে তিলওয়াত করতেন, তাদাব্বুর করতেন, এর ইল্ম অর্জনে সময় ব্যয় করতেন, নিয়মিত কুরআনের সাথে সময় কাটানো ছিলো তাদের একটি দৈনন্দিন অভ্যাস। কুরআনের একটি আয়াত বুঝার পিছনে দীর্ঘ সময় পড়ে থাকতো। কুরআনকে আমলে পরিণত করতেন। শুধু কী সাহাবী আজমাইন? তাবে তাবেয়ীদের মধ্যে এমন অনেক ইমাম ছিলো যাদের বলা হতো কুরআনের প্রেমিক। ইমাম নাফি আল মাদানি তার জীবনিতে ৭০ জনের অধিক তাবেয়ীকে কুরআন শুনিয়েছেন। শুধু কুরআন শুদ্ধতার পিছনে এতো সময় দিয়েছেন তিনি। এরপর তো তাদাব্বুরের বিষয় নিয়ে কথা বলতে হলে দেখা যাবে এই পুরো থিসিসে আমর কেবল সাহাবী আজমাইন ও তাবেয়ীরা কীভাবে কুরআন তাদাব্বুর করেছেন সেটা নিয়েই আলোচনা করতে হবে ।

আসলে কুরআন কারীম নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো:

لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে (সোয়াদ ২৯)।

অথচ সাহাবি আর আমাদের মাঝে একটি বিশাল তফ্যাৎ হচ্ছে তাঁরা কুরআন তাদাব্বুর করে বুঝত, আর আমরা তা থেকে পালিয়ে বেড়াই। ফলস্বরূপ কুরআন আমাদের হৃদয় বিগলিত করে না।

একটা পাহাড়ের কথা কল্পনা করি! যদি কুরআন তার উপর নাযিল হতো, সেটা ভয়ে ভারে চুরমার হয়ে যেতো। পাহাড়ের তুলনায় মানুষের হৃদয় ছোট্ট একটা দানার মতো।

কতো কতো কুরআন পাঠ শোনি , তবুও কেন বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না? কারন একটাই , তাদাব্বুর করি না। এই জন্যই প্রখ্যাত একজন আলিম বলেছেন-

মুসলিম উম্মাহর যখনি দুর্দিন আসবে, তার উচিত কুরআনের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন প্রথমে যাচাই করে নেয়া। সাধারণত উম্মাহর সমস্যা আসা শুরু হয় কুরআনের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মধ্য দিয়ে। আর কুরআনের তাদাব্বুর কমে গেলেই উম্মাহর উপর বিপদের ঘোর অমানিশা নেমে আসে। তখনো কিন্তু তিলাওয়াত ঠিকই চলতে থাকে। থাকে না শুধু 'তাদাব্বুর'।

ইবনে জারীর রহি: বলেন -

আমার ভীষণ অবাক লাগে, কুরআন তেলাওয়াত করে, অথচ তাদাব্বুর করে না, তাহলে সে কুরআন পাঠ করে কী মজা পায়? [৯]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন, 'আল্লাহর কালাম না বুঝে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব নয়। মানুষের কাছে চিকিৎসা বা হিসাববিদ্যার কোনো বই না বুঝে পড়া অস্বাভাবিক মনে হয়। তাহলে তারা কীভাবে আল্লাহর কালাম না বুঝে পড়ে, যে কিতাব তার দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য ও মুক্তির পথ!' -(আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ৪/২০২)

তাদাব্বুর (تَدَبُّر) অর্থ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা। অনুধ্যান করা। সাধারণত কুরআন কারীমের আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনাকে তাদাব্বুর বলে। এর আদেশের আয়াত থেকে আদেশ গ্রহন করা, উপদেশের আয়াত থেকে নসিহা নেওয়া, আর নিষেধের আয়াত থেকে নিষেধাজ্ঞা পালন করাই মূলত আমাদের হৃদয়কে বিগলিত করে। আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সহজ করে দেয়। পাপ পঙ্কীলতার শহরে ঈমান নিয়ে বাঁচতে সাহায্য করে। অথচ দিনকে দিন কুরআন বুঝা আর তাদাব্বুর থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষ

কেবল সমাজে অরাজকতাই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দেশে ধর্ষণ বেড়েছে, অপসংস্কৃতির কবলে কিশোর- কিশোরীরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নষ্ট করছে। সুদ ঘুষ খাওয়া লোকের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে ধর্মকে বিক্রি করে পেট চালানোর মতো নিকৃষ্ট কর্মের পরিমান। অথচ এই মুসলিমরাই রমজানে একবার কুরআন খতমা করে, অবসরে কুরআন শুনে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হুজুরদের দিয়ে কুরআন পড়ায়। উম্মাহর এই দূর্দশার একমাত্র কারণ তাঁরা কুরআন কে বুঝা, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছে। যে প্রসঙ্গ আল্লাহ ﷻ বলেন-

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِهِمۡ وَ عَلٰی سَمۡعِهِمۡ ؕ وَ عَلٰۤی اَبۡصَارِهِمۡ غِشَاوَۃٌ ۫ وَّ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ﴿۷﴾

আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।

(২:৭

মুসলিম উম্মাহর দূর্দশা পরিত্রানের উপায়

পৃথিবীর বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়, সম্ভ্রমহারা মুসলিম বোনের গগণফাটা চিৎকার। ইজ্জত নিলামে ওঠা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ। নাকে আসে শুধু রক্তের গন্ধ। আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে মেঘের চাঁদোয়ায় দেখা যায় কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে ধোঁয়া।

এ ধোঁয়া অন্য কিছুর নয়, আমাদেরই মতো কোনো আদম সন্তানের অগ্নিদগ্ধ সত্তা বা পুড়ে ভস্ম হওয়া তিলে তিলে গড়ে তোলা বাসস্থানের। পৃথিবীর যেদিকে তাকানো হয়, শুধু দেখা যায় নির্যাতন ও নিপীড়নে পিষ্ট মুসলিম। সর্বোত তারা নিষ্পেষিত পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত। ফিলিস্তিনের সঙ্গে আছে মুসলমানের রক্তের সম্পর্ক। কারণ, এ ভূমিতে রয়েছে অসংখ্য নবী-রাসুলের পদচিহ্ন। আছে প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদিস।

এ বরকতময় ভূমির মানুষগুলো সুখণ্ডশান্তি ও বরকতের দরিয়ায় থাকত প্লাবিত। কিন্তু এক দশক ধরে তারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত। আজাদির লড়াইয়ে তারা আজ সর্বহারা। দখলদার অভিশপ্ত ইহুদিদের হাতে মার খাচ্ছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম রক্ত ঝরছে। লাশের পাহাড় আকাশ ছুঁয়েছে। এ মৃত্যুর মিছিলের যেন ইতি নেই। অথচ ইতিহাস সাক্ষী দেয় একসময় মুসলমানরা অর্ধেক পৃথিবী (Half of the known world) শাসন করেছে, এবং জ্ঞান বিজ্ঞান, ন্যায় বিচারে সবার জন্য একটা রোল মডেল ছিল। ঐ সময়ে তারা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিল, বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের সবার সমঅধিকার, অন্য ধর্ম, মতের প্রতি শ্রদ্ধা সবই ছিল, যেখানে তখন ইউরোপ সহ অন্য দেশ গুলি কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল।মানুষ মুসলমানদের কাছে জ্ঞান বিজ্ঞান শিখতে আসত, আজকে যেমন মুসলমানরা অন্যদের কাছে শিখতে যায় । এই ইহুদীদের স্বর্ণযুগ ছিল মুসলমানদেরই শাসনামলে। স্পেনে মুসলিম শাসনকালে ইহুদীরা সবচেয়ে ভাল ছিল-এটাও ঐতিহাসিক সত্য। তবে কেন আজ এই অধঃপতন? কেনই বা উম্মাহ এতটা চেতনাহীন হয়ে পড়েছে? কোথায় হারিয়ে গেল খাব্বাব, খুবাইব, বিলাল, সুমাইয়া রা:-এর মতো দীপ্ত ঈমানের অধিকারী সেই মানুষগুলো? আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী রা:-এর মতো মুত্তাকি রাজনীতিবিদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ, মুয়াজ ইবনে জাবাল রা:-এর মতো বিজ্ঞ আলেম-ফকিহ, খালিদ বিন ওয়ালিদ রা:, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী,

মোহাম্মদ বিন কাসিমের মতো বীর যোদ্ধা; ওমর খৈয়াম, আল বিরুনিরা কোথায় হারিয়ে গেলেন? কেন আজ তাদের শূন্যতায় হাহাকার করছে এ ধরণী? হাসান বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হাফিজ রুমি, ইকবালরা কেন লিখছে না আজ আর বিজয়ের মহাকাব্য?এর অন্যতম প্রধান কারণ রব্বে কারিমের প্রথম নির্দেশ আমরা অগ্রাহ্য করে চলছি, যা বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রাসূলে আকরাম সা:-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। অথচ উম্মি নবী রাসূল ﷺ এই কুরআনের সংস্পর্শে আলোকিত করেছেন এক বর্বর জাতিকে। তিনি চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি সমাজকে আলোকিত করেছেন কুরআনের জ্ঞান দিয়ে। তৈরি করেছিলেন ‘দারুল আরকাম’ নামক প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা ‘মসজিদে নববী’ ও ‘সুফফা’য় বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

এই প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি তৈরি করেছিলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: এর মতো সাহাবী , যিনি প্রকাশ্য কোরআন তিলাওয়াত করা প্রথম সাহাবী। তিনি সেই সাহাবী যিনি কাবা শরিফে মাকামে ইবরাহিমের কাছে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে সুরা আর রহমানের কিছু অংশ তিলাওয়াত করে কুরাইশ নেতাদের হতবাক করে দেন। মুশরিকরা যখন তাঁকে নির্যাতন করেন তিনি বলেন- আল্লাহর শত্রুরা আমার কাছে খুবই তুচ্ছ। আমি আবারও গিয়ে তাদের সামনে কোরআন তিলাওয়াত করবো। [১০]

সাইয়েদ কুতুব (রহ.) ইসলামী সমাজবিপ্লবের ধারা বইয়ে লিখেছেন, সাহাবিরা একমাত্র কুরআন থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতেন এবং মানার জন্য কুরআন পড়তেন। এ কারণেই তারা সোনার মদিনায় সোনার মানুষ হতে পেরেছেন। আজকের সময় কোনো মুসলমান যদি ঠিক সাহাবিদের মতোই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে কুরআনকে গ্রহণ করে এবং মানার নিয়তে কুরআন অধ্যয়ন করে, তবে অবশ্যই তারা সাহাবিদের মতো সোনার মানুষ হতে পারবেন।

সাইয়েদ কুতুব রহ: ঠিকই বলেছেন। পূর্বসূরীদের দাপট, সাম্রাজ্য, খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো উম্মাহর ক্রান্তি লগ্নে একজন বীর সৈনিককে যদি আবার ফিরে পেতে চাই তবে কুরআনের ইল্ম মুসলিম উম্মাহর জীবনের পারতে পারতে স্থান দিতে হবে। এই কলুষিত জীবব্যবস্থা, বিশ্বব্যবস্থা থেকে পরিত্রানের উপায় হচ্ছে মুসলিম জাতিকে

আবার কুরআন নিয়ে ভাবতে হবে, উলুমুল কুরআনের ইল্ম অর্জন করতে হবে, পৃথিবীর আনাচে কানাচে কুরআনের ইল্ম ছড়িয়ে দিতে হবে, আগামী প্রজন্মকে কুরআনের সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিতে হবে। তবে আশা করা যায় ঘুমন্ত এই জাতি আবার জেগে উঠবে,বিবেকের দুয়ারে পাখিরা কড়া নাড়বে, সিরিয়া,শাম, আকসার আকাশে আবার ও বিজয়ের পতাকা উড়বে। উম্মাহর এই নিপীড়িত অবস্থা থেকে পরিত্রান পেতে কুরআনের সাথে আমরা কীভাবে সম্পর্ক করবো, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

কুরআন নিয়ে ভাবা

আল্লাহ ﷻ বলেন -

كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَيۡکَ مُبٰرَکٌ لِّيَدَّبَّرُوۡۤا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۲۹﴾

এই কল্যাণময় কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এটার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।' (৩৮:২৯)

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন, '

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوۡنَ الۡقُرۡاٰنَ اَمۡ عَلٰی قُلُوۡبٍ اَقۡفَالُهَا ﴿۲۴﴾

তবে কি এরা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না এদের অন্তর তালাবদ্ধ?' -(সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪)

হাদীস থেকে পাওয়া যায় রাসূল ﷺ কোরআনের একটি আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ভোর পর্যন্ত একটি আয়াত দিয়েই নামাজ আদায় করলেন। আর সে আয়াতখানা হলো, অর্থ : 'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ১১৮) (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ১০১০)

কুরআন নিয়ে এই ভাবনাকে আরবীতে বলে 'তাদাব্বুর', যার শাব্দিক অর্থ হলো পরিণতিফলের দিকে খেয়াল করা/চিন্তাভাবনা করা। তাদাব্বুরুল কালাম মানে হলো কথার শুরু-শেষ নিয়ে ভাবা এবং একাধিকবার কোন জিনিস নিয়ে চিন্তা করা। কুরআনের ক্ষেত্রে তাদাব্বুর দ্বারা বোঝানো হয় কুরআনের শব্দসমূহের অর্থ বোঝা,

আয়াতসমূহে যা বলা হচ্ছে সেগুলো নিয়া ভাবা, এর মাধ্যমে অন্তর দিয়ে উপকৃত হওয়া, কুরআনের নসীহতগুলো গ্রহণ করা এবং এর থেকে শিক্ষার্জন করা।

কুরআন নিয়ে ভাববো কেন?

কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর নাযিলকৃত প্রত্যাদেশ। এতে আমাদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও পথনির্দেশ। কুরআন নাযিলের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো বান্দা এর আয়াতগুলো নিয়ে ভাবনার সমুদ্রে ডুব দিবে। চিন্তার তলদেশ থেকে মনি-মুক্তো কুড়িয়ে আনবে। কুরআন নিয়ে আমাদের ভাবার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। নিম্নে কিছু তুলে ধরা হলো :

১. কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো মানুষ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। একে তিলাওয়াত করার পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিক্ষার্জন করবে। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" [সোয়াদ : ২৯]

সুতরাং বান্দা যখন কুরআন নিয়ে ভাববে তখন কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে। এ ছাড়া কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

২. অন্তর বিগলিত করা

আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হলেও শয়তান ও নফসের ফাঁদে পা দিয়ে প্রায়শই নিজেদের পঙ্কিলতার কাদায় নিমজ্জিত করে ফেলি। আল্লাহর নীতি হলো, যখনই বান্দা গুনাহে জড়িয়ে পড়ে, তিনি তার অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেন। হৃদয় থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নিয়ে তাতে আঁধারের কালোমেঘ প্রবিষ্ট করে দেন। ফলে বান্দার হৃদয় হয়ে পড়ে শক্ত কঠিন পাথরের ন্যায়। যার গুনাহের পরিমাণ যতো গাড়, তার অন্তর ততো বেশি কোমলতাহীন। ততো বেশি শক্ত। আর শক্ত হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকে। আল্লাহর ভয় তাতে কোন রেখাপাত করে না। আল্লাহর ধমকি তাকে বিচলিত করে না। এমন ব্যক্তি হয় আল্লাহর ব্যাপারে নিশঙ্কচিত্ত। যা তাকে ধীরেধীরে জান্নাতের পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।

হৃদয়ের এই কঠিনতাকে বিগলিত করতে বেশি বেশি কুরআনের তিলাওয়াত করা ও এতে বিবৃত আল্লাহর কথাগুলো নিয়ে ভাবনার আকাশে উড়াল দেওয়ার কোন বিকল্প নেই। হৃদয়ের ডানা মেলে যে যতো বেশি ভাবনার আকাশে উড়বে, তার হৃদয় ততো দ্রুত ও বেশি স্বচ্ছ হবে। এই ভাবনা গুনাহের কারণে সৃষ্ট অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে অন্তরে স্থাপিত করবে ঈমানের আলোকচ্ছটা।

৩. আমল করা সহজ হওয়া

কোরআন হলো মানবজাতির জীবনসমস্যার সমাধানে আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র। সুতরাং কোরআনের প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে হলে তার আদেশ, নিষেধ ও বিধি-বিধান মান্য করে চলতে হবে। আর এর জন্য কুরআনের অর্থ জানা, বোঝা ও তা নিয়ে চিন্তা করা বেশ ফলদায়ক। চিন্তা-ভাবনা মনের গহীনে কুরআনের শিক্ষা ও আদেশ-নিষেধকে গভীরভাবে গেঁথে দেয়। তখন আমল করার পথটা সহজে খুলে যায়। মূলত উপাদেয় খাবারের ঘ্রাণ নেয়ার মতো যদি শুধু কুরআনের তেলাওয়াতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়, তবে এর প্রকৃত স্বাদ ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

৪. ঈমান বৃদ্ধি করা

কুরআনের তিলাওয়াত ও এর ভাবনা মানুষের ঈমানী শক্তিকে বলীয়ান করে। দুর্বল ঈমানকে সবল করে। সাহাবায়ে কেরাম তাই ঈমানের মজবুতির জন্য কুরআন নিয়ে আলোচনা করতেন। কুরআনের মজলিসে বসতেন। কুরআনের ভাবনায় হারিয়ে যেতেন।

বিশিষ্ট সাহাবী জুনদুব বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, 'আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।'

[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৬১; সহীহ]

সাহাবিদের কুরআন শেখার মানেই হলো কুরআনের ভেতরকার কথামালাকে বোঝা, তা নিয়ে ভাবা ও একে আমলে পরিণত করা। কারণ কুরআন তাদের নিজেদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেবল তিলাওয়াত করার জন্য তাদের কুরআন শিখতে হতো না। সুতরাং কোন সাহাবী যদি বলেন আমি কুরআন শিখেছি এর মানে হলো তিনি কুরআনের বিধান ও নির্দেশনাবলী জেনেছেন, বুঝেছেন, ভেবেছেন ও একে আমলে রূপান্তরিত করেছেন।

৫. আল্লাহর তিরস্কার থেকে রক্ষা পাওয়া

যারা কুরআন তিলাওয়াত করার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, কুরআনের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ নিয়ে ভাবে না আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। এক আয়াতে তিনি বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা- ভাবনা করবে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা পড়ে রয়েছে?" (সূরা মুহাম্মাদ : ২৪)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্নিত হয়েছে, একবার রাসূল সা. উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলে ইয়ামানের এক যুবক বলে উঠল, বরং অন্তরের উপর তালাই পড়ে থাকে; যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তা খুলে দেন এবং এর থেকে মুক্তি দেন। সেই যুবকেন কথা উমর রা. মনে মনে স্মরণ করে রাখলেন। অবশেষে যখন তিনি খলীফা হন, তখন সেই যুবকের কাছ থেকে তিনি (বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের) সহায়তা গ্রহণ করেন।

সুতরাং কেউ যদি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে তবে বুঝতে হবে তার অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে। তার উচিত অবিলম্বে এই তালা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর এই তিরষ্কারে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

৬. কুরআনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করা

মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, যার সাথে তার বেশি সময় কাটে তার প্রতি ভালবাসা জন্ম হয়ে যায়। অদ্ভুত এক আকর্ষণের বন্ধনে বাঁধা পড়ে যেতে হয় উভয়কে। কুরআন নিয়ে ভাবনাতে যখন কারো সময় ব্যায় হয় তখন কুরআনের সাথেও তার একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়। পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। কুরআনের প্রতি জন্ম নেওয়া ভালবাসার মিষ্টতা তো ব্যক্তি নিজেই দুনিয়ার বুকে অন্তরে অনুভব করে, বাকি তার প্রতিও যে কুরআনের হৃদয়ে ভালবাসার চারা অঙ্কুরিত হয়েছে তা বোঝা যাবে কবর ঘরে প্রবেশ করার পরে।

মানুষের ভালবাসার সমাপ্তি ঘটবে যেখানে, কুরআনের ভালবাসার প্রকাশ সেখান থেকে ঘটা শুরু হবে। দুনিয়াতে মানুষ একে অপরকে যতই ভালবাসুক না কেন, কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবার পর সবকিছু ভুলে যাবে। সবার মুখে থাকবে কেবল ইয়া নাফসী!

ইয়া নাফসী! সেই একাকি আর অসহায়ত্বের মুহূর্তে কুরআন এসে তার ভালবাসার প্রমাণ দিবে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের ময়দানে কুরআন পর্যুদস্ত লোকের আকৃতিতে সামনে এসে জিজ্ঞেস করবে, আমাকে চিনতে পারছ? সেই ব্যক্তি বলবে, না তো! কে তুমি? তখন কুরআন উত্তর দিবে, আমি তোমার সঙ্গী কুরআন। যে তোমাকে দিনে পিপাসার্ত আর রাতে নিদ্রাহীন করে রাখত। (মুসনাদে আহমদ : ৩৯৪, সহীহ)

কুরআনের পর্যুদস্ত চেহারা নিয়ে হাজির হবার রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ বলেন, মুলত ওই ব্যক্তি দিনরাত কুরআন নিয়ে পড়ে থাকার কারণে যেমন মলিন চেহারার ও পর্যুদস্ত হয়েছিল, কুরআনও আজ তার দুর্দিনে তার মুক্তির জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে পর্যুদস্ত হচ্ছে- এমনটি বোঝানো হলো উদ্দেশ্য। ভালবাসার এই লেনাদেনা কত যে গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারী কাল হাশরের ময়দানে তা আমরা হাড়েহাড়ে টের পাব।

৭. নিজেকে যাচাই করা

পবিত্র কুরআনের একটি মজার ব্যাপার হলো, যে-কেউ কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি যদি কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে তবে কুরআনকে সে একটি দর্পন হিসেবে আবিষ্কার করবে। সেই দর্পনে নিজেকে যাচাই করে নিতে পারবে সে। কুরআন নিজের মতো করে বিভিন্ন মানুষ ও তাদের স্বভাব-প্রকৃতির কথা তুলে ধরে। মানুষের নানাবিধ অবস্থা, তার থেকে উত্তরণের উপায় বাতলে দেয়। এগুলোর ভেতর দিয়ে সহজেই নিজের অবস্থা যাচাই করে নেওয়া যায়। কে কোন ক্যাটাগরির সেটা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে নিজের কোন কোন স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে এবং সংশোধনের ধরন কি হবে তা-ও স্পষ্ট হয়ে যায়।

৮. কুরআনের প্রতি অবহেলাকারী না হওয়া

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করাও কুরআনের প্রতি এক ধরনের অবহেলা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَقَالَ الرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

"এবং রাসূল বলেছে, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে।"

এই আয়াতে কুরআনকে পরিত্যাজ্য করা ও কুরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের অভিযোগ করা হয়েছে কিছু মানুষের প্রতি। এই অবহেলার নানা শ্রেণিভেদ আছে। ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ এর ছয়টি ধরন উল্লেখ করেছেন। তারমধ্যে একটি হলো কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা, কুরআনে আল্লাহ তাআলা কী বলতে চাইলেন তা বোঝার চেষ্টাকে পরিহার করা। সুতরাং তাদাব্বুরে কুরআনের পথ ধরে আমরা ইচ্ছা করলেই এই শ্রেণির লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। (আলফাওয়াইদ : ৮২)

উলুমুল কুরআনের ইল্ম অর্জন করা।

কুরআনের সাথে সম্পর্কিত ইল্মকে উলুমুল কুরআন বলা হয় (علوم القران)

এটি এমনি এক ইল্ম যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। মূলত কুরআনের ইল্ম অর্জন করার মাধ্যমেই আমরা রবের কালামকে চিনতে পারি,এর গুরুত্ব বুঝতে পারি , জীবনের প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের কাছে আসতে পারি। তাই কুরআনের প্রাথমিক ইল্ম অর্জন করতে আমরা যেই পন্থাগুলো অবলম্বন করতে পারি তা নিম্নরূপ :

১. কুরআন সহী শুদ্ধ করা।

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী -রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কোরআন। পূর্ব পূবর্বর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল-কোরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন। আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

‘রমযান মাস, যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদের্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।’ (সূরা আল-বাকারা-১৮৫)

হিদায়াতের এই কিতাব আল -কোরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ করা হয়েছে। আল-কোরআন শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আল-কোরআন অধ্যয়ন করা, কোরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

কাজ। কারণ এ কো রআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, হিদায়াতের সঠিক পথ। রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه

'যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' বুখারী

মুসলিম শরীফে আছে :

اَفَلَا يَغْدُوْا اَحَدُكُمْ اِلٰى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ اٰيَتَيْنِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ ثَلِاثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ.

"তোমাদের মধ্যে কেহ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দুইটি আয়াত কেন শিক্ষা লাভ করে লয় না? কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা দুইটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এইরূপে তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা এবং চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এমনিভাবে যত সংখ্যক আয়াত হবে, তত সংখ্যক উট হতে অধিক ভাল।

কুরআনের সর্বপ্রথম হক কুরআনকে সহজভাবে তিলওয়াত করতে জানা। । রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارَ

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়বে এবং তা হিফজ করবে এবং তার হালালকৃতকে হালাল ও হারামকৃতকে হারাম জেনে চলবে, (অর্থাৎ, কুরআনের খেলাফ যেন কোনো আকীদা না হয়। উপরে আমলের কথা বলা হয়েছিল, এখানে আকীদার কথা বলা হলো।) আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন এবং তার আত্মীয়বর্গের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে ছিল।' -তিরমিযী

অথচ আফসোস পরিতাপের বিষয় উম্মাহর সন্তানরা আজ সূরা ফাতিহা টি পর্যন্ত সহী করতে পারে না। যে জাতি কে নিচে শুয়ে পেটে চাপ দিলে ও আলহামদুলিল্লাহ! শব্দ

টা সহী বের হবে না। সে জাতির হারানোর আর কিছুই নেই। সবকিছু হারিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে আছে। অথচ লজ্জার বিষয় এই বোধটুকুও তাদের জাগ্রত হয়নি।

১. আরবী শেখা

কুরআনের ভাষা যেহেতু আরবী তাই কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার জন্য আরবীভাষা শেখা সবচে ফলপ্রসু ও কার্যকরী মাধ্যম। এটি খুব কঠিন কিছু নয়। সুদৃঢ় ইচ্ছা আর আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এটি সহজেই সম্ভব। সেক্ষেত্রে কুরআন নিয়ে ভাবনার জন্য অনুবাদের দারস্থ হতে হবে না। নিজে নিজেই তাদাব্বুরে কুরআনের জগতে প্রবেশ করতে পারবেন।

বিভিন্ন ব্যস্ততা বা নানানরক অসুবিধার কারণে যাদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে আরবীভাষা শেখা সম্ভব নয় তারা সহজ একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। তা হলো, কুরআনে যেসব শব্দ বা আয়াত খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয়েছে সেগুলো মুখস্ত করে ফেলতে পারেন। এতে করে অল্প শ্রমে অধিক ফল লাভ হবে। যে আয়াতটি কুরআনে বিশ বার ব্যবহার হয়েছে তার অর্থটা আপনি মুখস্ত করে ফেললে একটা আয়াতের মাধ্যমে আরো উনিশটা আয়াত আপনার আয়ত্ব হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থটি চোখ বন্ধ করে মুখস্ত করার চেয়ে প্রতিটি শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বুঝলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। মনেও থাকে দীর্ঘদিন। এমনিভাবে যে শব্দটা ত্রিশবার ব্যবহার হয়েছে তা একবার মুখস্ত করে নিলে ত্রিশটা জায়গায় ব্যবহৃত সেই শব্দটির অর্থ বোঝা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আজকাল এই জাতীয় কিছু বইপত্রও রচিত হয়েছে। আপনি চাইলে সেগুলোর সহায়তাও নিতে পারেন।

২. কুরআনের অনুবাদ/তাফসীর অধ্যয়ন করা

আরবীভাষা শিখছেন বা শিখছেন না এমন সবার জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করার পাশাপাশি পঠিত অংশ থেকে কিছু অনুবাদ

পড়ে ফেলা। তারপর সেই কথাগুলো নিয়ে কিছু সময় ভাবনা-চিন্তায় ব্যায় করা। এক্ষেত্রে সবচে ভালো হয় যদি নামাজে পঠিত সূরা ও আয়াতগুলোর অনুবাদ পড়ে ফেলেন। এটি আপনার নামাজে খুশুখুযু সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। নামাজের প্রতি মনোযোগ ও একাগ্রতাকে আগের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি করবে।

কুরআনের অনুবাদ অনেক সময় পুরোপুরি মনে থাকে না। কারণ সবসময় কেবল অনুবাদ পড়ে পুরো বক্তব্যটা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হয় না। হাতে সময়-সুযোগ থাকলে অনুবাদের সাথে সামান্য তাফসীর অধ্যয়ন করাকে যুক্ত করে নিতে পারেন। এতে আপনার কুরআনের সাথে সম্পর্ক আরও মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। পঠিত অর্থগুলো হৃদয়ের গহীনে আরও জোরালোভাবে গেঁথে যাবে।

শায়খ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ খুব সুন্দর কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যে কোন বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করার সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন। তা হলো,

ক. কঠিন বইয়ের পরিবর্তে সহজ-সরল বই নির্বাচন করা।

খ. বড় ও বিশাল আকৃতির বইয়ের পূর্বে ছোট আকারের বই পড়ে নেওয়া।

গ. যে কোন শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থাদী পড়ার পূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ের সহজ বই পড়া।

(কী পড়বেন কীভাবে পড়বেন : ৪৪)

এমন পরামর্শ প্রদানের কারণ হলো, পাঠক যখন নতুন কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে সহজ-সরল বই পরিহার করে গুরুগম্ভীর ও বিস্তৃত আলোচনার ঢাউস সাইজের কোন বই হাতে তুলে নেন তখন স্বাভাবিকভাবেই এটি তার মস্তিষ্কে আলাদা চাপ তৈরি করে। বিস্তারিত আলোচনার কারণে তার কাছে পুরো ব্যাপারটিই অত্যন্ত জটিল ও কঠিন মনে হয়। অথচ এই বিষয়ে যদি সে সংক্ষিপ্ত ও গোছানো কোন বই পড়তো তাহলে কখনোই এমন মনে হতো না এবং বিরক্তি, বিকৃষ্ণা ও অনীহা তৈরি হতো না।

প্রতিটি তাফসীরগ্রন্থেরই কিছু আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। আগে আপনাকে সেসম্পর্কে জেনে নিতে হবে। তারপর নিজের রুচি-অভিরুচি, অবস্থা ও অবস্থানের বিবেচনায় উপযোগী তাফসীরগ্রন্থটি বেছে নিতে হবে।

অনেককেই দেখা যায় তাফসীর অধ্যয়ন শুরুই করেন তাফসীরে ইবনে কাসীর দিয়ে। যার কারণে ফলাফল যা হবার তাই হয়। এক পর্যায়ে এসে অধ্যয়নের ইতি টানতে হয়। কারণ তাফসীরে ইবনে কাসীর হলো প্রাচীন তাফসীরগ্রন্থ। এটি এযুগের সাধারণ মানুষের উপযোগী করে সাজানো-গোছানো নয়। বরং প্রতিটি আয়াতের অধীনে সেই সংক্রান্ত যত হাদীস ও আসার রয়েছে লেখক সেগুলো সনদসহ সংকলিত করেছেন। ফলে আহলে ইলম ও গবেষকদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী একটি তাফসীর। কিন্তু সাধারণ কারো জন্য তাফসীর অধ্যয়নের প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে উপযুক্ত নয়। হ্যা, যদি কেউ প্রাথমিক পর্যায়ের তাফসীরগ্রন্থ পড়ে আরো গভীরভাবে তাফসীর অধ্যয়ন করতে চান বা রেওয়াতভিত্তিক তাফসীর পাঠে আগ্রহবোধ করেন তবে তার জন্য তাফসীরে ইবনে কাসীর ঠিক আছে।

প্রাথমিকভাবে সাধারণ পাঠকরা তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন বা তাফসীরে মারেফুল কুরআনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কিংবা আবূ বকর যাকারিয়া কৃত তাফসীরগ্রন্থটি দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে সবচে ভালো হয় যদি নিজের সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরে নির্ভরযোগ্য কোন আলেমের পরামর্শ নিয়ে তাফসীরগ্রন্থ নির্বাচন করা হয় এবং তার তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করা হয়। এতে নির্বাচনটা যেমন অনেক বেশি নিঁখুত হবে তেমনি অধ্যয়নও অনেক বেশি ফলপ্রসু হবে বলে আশা করছি।

এই বিষয়ে মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. এর একটি নসীহত প্রণিধানযোগ্য। তিনি সূরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের আলোচনায় লেখেন, ‘প্রতিটি মানুষ কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুক এটিই কুরআনের দাবি। সুতরাং একথা মনে করা ঠিক নয় যে, কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা শুধু ইমাম ও মুজতাহিদ (বা বড় বড় আলিমের) কাজ। অবশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পর্যায়ের মতোই চিন্তা-ভাবনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ...

সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীর পড়বে এবং চিন্তা-ভাবনা করবে তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও ভালবাসা এবং আখিরাতের ফিকির ও চিন্তা সৃষ্টি হবে। আর এটিই হচ্ছে সকল সফলতার চাবিকাঠি। তবে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষের উচিত কোনো আলিমের কাছে অল্প অল্প করে পাঠ করা। এর সুযোগ না থাকলে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব পাঠ করবে এবং যেখানেই কোনো প্রশ্ন ও সংশয় দেখা দেয় নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা উত্তর না খুঁজে বিজ্ঞ আলিমের সাহায্য নিবে। (মাআরিফুল কুরআন ২/৪৮৮)

৩. বেশি বেশি প্রশ্ন করা

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হই। আমাদের হৃদয়ের জমীনে সাগর পাড়ের ঢেউয়ের মতো ভেসে আসে অজস্র সব জিজ্ঞাসা আর কৌতুহল। আমরা সেগুলোর উত্তর কুরআনের আলোকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করতে পারি। এই কাজটা করতে পারলে কুরআনের সাথে আমাদের বন্ধনটা কেবল নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য হবে না। এর পরিধি হবে আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এভাবে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারলে জীবন-সমস্যায় পতিত হলেই দেখবেন কুরআন আপনার সামনে সমাধান নিয়ে হাজির হয়ে যাবে।

ধরেন আপনার মনে কোন গুনাহের প্রবণতা এসে বারবার উঁকি মারছে। কাজটা করবেন কি করবেন না ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। এমন সময় কুরআন আপনার সামনে একটি পয়গাম নিয়ে উপস্থিত-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى

"আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।" (সূরা নাযিআত : ৪০-৪১)

এরপর মনে হয় না আপনার পক্ষে এই পয়গামকে পাশে ঠেলে সেই কাজ করা সম্ভব হবে।

কুরআনের সাথে আমাদের প্রাণের বন্ধন ঢিলা হওয়ার কারণেই আজ চারদিকে এতো দুঃখ-দুর্দশা আমাদের ঘিরে ধরেছে। উম্মাহর কপালে নেমে আসা বর্তমান সময়ের বিপর্যয়ের পেছনেও এটি অন্যতম একটি কারণ। হাদীসে এসেছে, এই কুরআনের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা একটি জাতিকে সমুন্নত করেন আবার অন্য জাতিকে পর্যুদস্ত করেন। (সহীহ মুসলিম : ৮১৭) তাই কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ যাতে এমন না হয় যে, এর মাধ্যমে আমাদের পর্যুদস্ত ও অপদস্ত হতে হয়। বরং আমরা কুরআনকে এমনভাবে আপন করে নিতে সচেষ্ট থাকব যে, কুরআনের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমাদের ইহকালে ও পরকালে সম্মানীত করবেন। আল্লাহই সর্বোচ্চ তাওফীকদাতা।

কুরআনের ইল্ম ছড়িয়ে দিই

ইল্ম অর্থ জানা। কুরআনের ইল্ম অর্জন করার মাধ্যমে যখন আপনি কুরআন কে চিনলেন জানলেন তখন আপনার মিশন হচ্ছে তা অপরের কাছে পৌঁছানো। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন -

ٌخَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه

'যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' বুখারী

বর্তমান সমাজকে সোনার সমাজে পরিনত করতে হলে আমাদের নিজেদেরকে কুরআন শিখতে হবে এবং অপরের কাছে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। আপরের কাছে এই ইল্ম পৌঁছানোর জন্য আমরা যেই পদক্ষেপ গুলো নিতে পারি

- কুরআনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা: আমাদের সমাজে এমন প্রতিস্ঠা বিরল যেখানে উলুমুল কুরআন এর শাখাগুলো নিয়ে বিস্তার পড়ানো এবং গবেষণা করার ব্যবস্থা আছে। বর্তমান সমাজের জন্য এমন প্রতিষ্ঠান খুবই জরুরত।

- বাসাবাড়িতে একজন করে কুরআনের শিক্ষিকা তৈরি করা যিনি মা বোনদের কুরআন শিক্ষা দিবে। সরকার গণশিক্ষা নামক একটি প্রজেক্টের কাজ করে থাকেন। আমার মনে হয় কুরআন নিয়ে এমন একটা প্রজেক্ট তৈরি করা সময়ের দাবি। সরকার যদি উক্ত পদক্ষেপ নেন আশা করা যায়, অশুদ্ধতার বেড়াজালে আটকে পড়া কুরআনের বাণীগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়বে।
- শিক্ষা সংস্কৃতি তে কুরআনকে স্থান দেওয়া। শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক পর্যন্ত কুরআন তিলওয়াত শেখা, কুরআন কে আলাদা একটি সাবজেক্ট হিসেবে রাখা, কুরআন নিয়ে রিসার্চ করতে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা । কিন্তু আমাদের

সন্তানগুলোর এহেন অবস্থা যে ধর্মীয় কিতাব হিসেবে কুরআন তাদের কাছে একটি বোঝা বৈ আর কিছুই নয় । তাদের মন মগজে এই ধারণাটি বদ্ধ হয়ে আছে যে এটা কেবল হুজুররাই পড়বে। পশ্চিমা সভ্যতা, শিক্ষায় তাদের মগজধোলাই হয়ে গিয়েছে । যাঁর ফলাফল স্বরুপ জাতি আজ দিশেহারা। এই জন্য বিঞ্গরা বলে থাকেন-

একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়াই যথেষ্ট

- উম্মাহর মা তৈরি করা। যাঁরা আবার জন্মে দিবে একজন খালেদ বিন ওয়ালিদ কে, একজন ওমর কে (রাদিআল্লাহু আনহুমা)

  এই জন্য পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নজর দিতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা থেকে বাজারের দার পর্যন্ত যদি ইসলামের আলো আবার প্রবেশ করানো যায়, উম্মাহর মা দের যদি কুরআনের সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেওয়া যায়, আশা করা যায় আবার ও পাখিরা নিড়ে ফিরবে।

কুরআনের আলোকে মুমিনের ব্যক্তিগত জীবন

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحۡمَۃٌ لِّقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ ﴿۲۰﴾

এ (কুরআন) হচ্ছে মানুষের জন্য সুস্পষ্ট দলিল, (সর্বোপরি) বিশ্বাসীদের জন্য তা হচ্ছে জ্ঞানের কথা,পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ।' (সূরা ৪৫ : আয়াত ২০)

কুরআন মানুষের মৌলিক প্রকৃতির শিকড় ধরে টান দেয়, অস্তিত্বের গভীরে তুলে আলোড়ন, চিন্তা-চেতনায় নিয়ে আসে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। কুরআনের আলোকে একজন মুমিনের ব্যক্তিগত জীবন কেমন হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও রাসূল ﷺ এর হাদিস ও জীবনি থেকে ও আমরা জানতে পারি একজন মুমিনের ব্যক্তিগত জীবন কেমন হওয়া উচিত ।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ :

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا ادۡخُلُوۡا فِی السِّلۡمِ کَآفَّۃً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّیۡطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ ﴿۲۰۸﴾

হে ঈমানদাররা, তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২০৮)

নিজেকে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবিষ্ট করতে হলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। একজন মুমিনকে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আল্লাহ যা আদেশ করছেন কোনো যুক্তি তর্ক ছাড়া তা মেনে নেওয়া,আর যা হারাম করেছে সাহাবী আজমাইন দের মতো শুনলাম মেনে নিলাম মনোভাব নিয়ে তা পালন করতে হবে।

আমাদের নবীজি (সা.) ও -পূর্ববর্তী সব নবীকে মহান আল্লাহ আত্মসমর্পণের আদেশ করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে

قُلۡ اِنِّیۡ نُهِیۡتُ اَنۡ اَعۡبُدَ الَّذِیۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الۡبَیِّنٰتُ مِنۡ رَّبِّیۡ ۫ وَ اُمِرۡتُ اَنۡ اُسۡلِمَ لِرَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۶۶﴾

, ‘বলুন, আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, এমতাবস্থায় আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, আল্লাহ বাদ দিয়ে যাদের তোমরা আহ্বান করো। আর আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য।’ (সুরা : মুমিন, আয়াত : ৬৬)

ইবরাহিম (আ.)-কে নির্দেশ করা হয়েছে— যখন তাঁর রব তাঁকে বললেন, ‘তুমি আত্মসমর্পণ করো (ইসলাম গ্রহণ করো)।’ তিনি বলেন,

২:১৩১اِذۡ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسۡلِمۡ ۙ قَالَ اَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ﴿۱۳۱﴾ ়

আমি সমস্ত সৃষ্টির রবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম।

’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৩১)

বিশুদ্ধ আকিদা : একজন মুমিনের উচিত বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা, মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা, একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা, কুফর, বিদআত থেকে নিজেকে বিরত রাখা পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবিষ্ট হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ ﴿۱۴﴾

‘নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো। (সুরা : ত্বহা, আয়াত : ১৪)

একনিষ্ঠভাবে ইবাদত : একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর ইবাদত করা মুমিনের উপর বাঞ্ছনীয় । ইবাদত বহু ধরনের হতে পারে, যেমন—কুরআনে নামাজের নির্দেশ দেয়, পবিত্র কোরআনে নামাজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে

اِنَّ الصَّلٰوۃَ کَانَتۡ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ کِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا ﴿۱۰۳

—‘নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ কায়েম করা মুমিনদের জন্য ফরজ।’ (সুরা : নিসা, আয়াত : ১০৩)

কুরআনে জাকাত-সাদাকার নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَۃً تُطَهِّرُهُمۡ وَ تُزَکِّیۡهِمۡ بِهَا وَ صَلِّ عَلَیۡهِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّهُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۰۳﴾

—'তাদের সম্পদ থেকে সদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।'

ইসলাম রোজার নির্দেশ দেয়। ইরশাদ হয়েছে

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا کُتِبَ عَلَیۡکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۸۳﴾

, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৩)

ইসলাম হজ করার নির্দেশ দেয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

رٰهِیۡمَ ۬ۚ وَ مَنۡ دَخَلَهٗ کَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الۡبَیۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَیۡهِ سَبِیۡلًا ؕ وَ مَنۡ کَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۹۷﴾

فيه ايتٌ بينت مقام ابرهيم ۬ۚ و من دخلهٗ كان امنا و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غنى عن العلمين ٩٧

তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী' (সুরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ৯৭)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আমর ইবনে দিনার (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা হজ ও ওমরাহ পরস্পর পালন (হজ সমাপনের পর ওমরাহ এবং ওমরাহর পর হজ) করবে, কেননা তা (এ দুটি) অভাব-অনটন ও

পাপকে দূর করে দেয়, যেমন (কামারের) হাপর লোহার মরিচা দূর করে থাকে। (নাসায়ি, হাদিস : ২৬৩০)

কুরআনে মুমিনদের জন্য হারাম হালালের বিধান দেওয়া আছে।

পর্দার বিধান দেওয়া আছে।

ইসলাম মানুষকে লজ্জাশীলতা ও পর্দার বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِهِمۡ وَ یَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَهُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَزۡکٰی لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیۡرٌۢ بِمَا یَصۡنَعُوۡنَ ﴿۳۰﴾

'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।' (সুরা : নূর, আয়াত : ৩০)

উত্তম চরিত্র : ইসলাম উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়, পবিত্র কোরআনে নবীজি (সা.)-কে উদ্দেশ করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیۡمٍ ﴿۴﴾

'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।' (সুরা : কলম, আয়াত : ৪)

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি (সা.) বলেছেন, যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলি পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠিয়েছেন। (শরহুস সুন্নাহ, মুসনাদে আহমদ)

এ জন্য ইসলাম মুমিনকে অন্যদের সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়। যেমন—সুরা বাকারায় বলা হয়েছে—'

وَ قُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا

আর মানুষকে উত্তম কথা বলো।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৮৩)

আল্লাহ বলেন,

وَ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَ لَا تُشۡرِکُوۡا بِہٖ شَیۡئًا وَّ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّ بِذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ الۡجَارِ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡجَارِ الۡجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ ۙ وَ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ مَنۡ کَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا﴿۳۶﴾ۙ

‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট ও দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ করবে। ’ (সুরা নিসা, আয়াত ৩৬)।

কুরআনের আলোকে মুমিনের পারিবারিক জীবন

দ্রুত বিয়ে করা ও লজ্জাস্থানের হিফাজত করা

একজন মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আর এ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে পারিবারিক জীবনে ইসলামের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে। একটি পরিবারের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিয়ে। আধুনিক সমাজে পশ্চিমা সভ্যতার দাসত্ব করা এই পৃথিবীতে বিয়ে কঠিন ও যিনাকে সহজ করা হয়েছে অথচ আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন-

আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَ اَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ وَ الصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَ اِمَآئِکُمۡ ؕ اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۳۲﴾

'আর তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদের বিয়ে করিয়ে দাও এবং তোমাদের সৎ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদেরও। যদি তারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তার নিজ অনুগ্রহে ধনী বানিয়ে দেবেন।' -সূরা নূর: ৩২

আল্লাহ আর ও বলেন

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ٢١]

"আর তাঁর নিদর্শনা-বলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

হজরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ.) হাদিসে বিয়ের প্রতি উৎসাহ ও তাকিদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, হজরত আবু আইয়ুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)

বলেছেন, ‘চারটি জিনিস নবীদের চিরাচরিত সুন্নত। ১. লজ্জা-শরম, ২. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৩. মেসওয়াক করা এবং ৪. বিয়ে করা।’ -সুনানে তিরমিজি: **১০১৮**

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, ‘হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক (বিবাহের ব্যয় বহনের) সামর্থ্য আমাদের ছিলো না। তিনি বলেন, হে যুবসমাজ! তোদের বিয়ে করা উচিত। কেননা এটি দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রাখে সুরক্ষিত। আর তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে, কেননা রোজা তার যৌনশক্তিকে দমিয়ে রাখবে।’ -সুনানে তিরমিজি: **১০১৯**

- **পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা।**

মুসলিম ব্যক্তি তার উপর পিতামাতার অধিকারের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, আরও বিশ্বাস করে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাঁদের আনুগত্য ও তাঁদের প্রতি ইহসান করার আবশ্যকতার প্রশ্নে; এটা শুধু এ জন্য নয় যে, তাঁরা তার অস্তিত্ব ও জন্মের উপলক্ষ, অথবা তাঁরা তার জন্য এমন সুন্দর সুন্দর ও ভালো ভালো অবদান রেখেছেন, যা তাকে প্রতিদান স্বরূপ তাঁদের সাথে সেরূপ উত্তম আচরণ করতে বাধ্য করে, বরং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার আবশ্যকতার অন্যতম কারণ হল- আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের আনুগত্য করাকে ওয়াজিব (আবশ্যক) করে দিয়েছেন এবং সন্তানের উপর পিতামাতার আনুগত্য করা ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার বিষয়টিকে তিনি ফরজ করে দিয়েছেন, এমনকি তিনি বান্দা কর্তৃক একমাত্র তাঁর ইবাদত করার আবশ্যকীয় অধিকারের সাথে এ বিষয়টিকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤ ﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

“আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ‘ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। আর মমতাবেশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।”[1] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩ - ২৪

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ ﴾ [لقمان: ١٤]

“আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।”[সূরা লুকমান, আয়াত: ১৪]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে প্রশ্নাকারে বলেন:

« مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى ؟ قَالَ : « أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أَبُوكَ » . (متفق عليه).

“আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার পিতা।”[বুখারী, হাদিস নং- ৫৬২৬; মুসলিম, হাদিস নং- ৬৬৬৪

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলে:

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » . (متفق عليه).

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া এবং কারও প্রাপ্য আটক করে অন্যায়ভাবে কোন কিছু নেওয়াকে; আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় করেছেন: অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করাকে।”[বুখারী, হাদিস নং- ২২৭৭; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৫৮০]

- **ভাইবোনদের সাথে আচরণ**

হাদিসে বর্ণিত আছে:

« حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده » . (رواه البيهقي).

“ছোট ভাই-বোনের উপর বড় ভাই-বোনের অধিকার ঠিক তেমন পর্যায়ের, যেমন অধিকার সন্তানের উপর তার পিতামাতার।”[বায়হাকী এবং হাদিসটি দুর্বল।

তাই একজন মুমিনের উচিত ভাইবোনদের সাথে সদাচরণ করা, সম্পত্তিতে থাকা তাদের অধিকার আদায় করা। তাদের খোঁজ খবর নেওয়া।

- **সন্তানদের সাথে আচরণ**

নেককার সন্তান হচ্ছে সদকায় জারিয়াহর মাধ্যম। তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তম তারবিয়াতের মাধ্যমে সন্তানকে ইসলামিক অনুশাসনে মানুষ করা প্রতিটি মুমিনের আবশ্যকীয় দায়িত্ব । আল্লাহ ﷻ বলেন- জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-

সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। (এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে) তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে। (সুরা আনফাল, আয়াত : ২৮)

وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عَن أبِيهِ، عَن جَدِّهِ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوا أوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في المضَاجِعِ».حديث حسن رواه أَبُو داود بإسناد حسن বাংলা অনুবাদ আমর ইবনে শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আম্রের দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাজের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন দশ বছরের সন্তান হবে, তখন তাদেরকে নামাজের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

’ [আবু দাউদ ৪৯৫, আহমদ ১৬৬৫০, ৬৭১৭]

এছাড়া আজ বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং চাকরি ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলাকেই শুধু দায়িত্ব মনে করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সন্তানকে হালাল ও বৈধ পন্থায় আয়-রোজগার শেখানোও পিতামাতার কর্তব্য। কিন্তু এটিই একমাত্র দায়িত্ব নয়; বরং তাদেরকে ইসলামী সভ্যতা (তাহযীব) শেখানো, দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি শেখানো এবং একজন দ্বীনদার-নামাযী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীস শরীফে এসেছে- ‘জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।’ -সহীহ বুখারী ১/২২২ হাদীস ৮৯৩

সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে থাকবে। আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে

আপিল করবে যে, তারা আমাকে দ্বীন শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

কুরআনের আলোকে মুমিনের সামাজিক জীবন

রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে শত্রুতা লালন করো না, পরস্পরকে হিংসার চোখে দেখো না, একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আল্লাহর সব বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলমানের জন্য তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েজ নেই।

বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃত অর্থেই নিজের মাবুদ বানিয়ে নেয়, তখন তার মধ্য থেকে সবধরনের নেতিবাচক প্রবণতা হ্রাস পায়। যাদের অন্তর সর্বক্ষণ আল্লাহর মহিমা প্রকাশে ব্যস্ত তারা দুনিয়ার নীচতায় গড়াগড়ি খেতে পারে না।

এই ধরনের মানুষ সমাজে এমনভাবে জীবনযাপন করেন যেভাবে ফুলের সুবাস সর্বত্রই চলাফেরা করে কিন্তু কারও সঙ্গে সংঘাত বাঁধায় না। সবার কাছে পৌঁছে, কারো প্রতি নেই অন্যায় পক্ষপাত। কিংবা তাদের তুলনা দেওয়া যায় আলোর সঙ্গে। আলো তার নিজেকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়, তার মধ্যে কারো থেকে খুশি হওয়া বা কাউকে ভয় করার ব্যাপার নেই।

বাগানের গাছপালা যেমন একে অপরের গলা জড়িয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, এই ধরনের লোকেরাও তেমন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে পাশে থাকে।

ইসলামের জ্ঞান একজন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে হাসিল করুক বা না করুক, সে যখন মুসলিম পরিচয় বহন করে তখন তাকে আপন মুসলিম ভাইদের মাঝে এমনভাবে বসবাস করতে হবে যে তার কারো সাথে শত্রুতা নেই এবং কাউকে সে হিংসা করে না।

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

‘সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরাবে বরং সৎ কাজ হ’ল, যে ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, পরকালের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত কিতাব ও নবী-রাসূলগণের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহববতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং যারা কৃতপ্রতিজ্ঞা পালনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী; তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই আল্লাহভীরু’ (বাক্বারাহ ১৭৭)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাক্বী তথা আল্লাহভীরুদের গুণাবলীতে একদিকে যেমন ঈমান ও সালাতের মত মৌলিক ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি যাকাত এবং সমাজের অসহায় নিঃস্বদের সাহায্য-সহায়তার মত সামাজিক কার্যক্রমের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনও ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। নিম্নে কুরআনের আলোকে মুমিনের কয়েকটি সামাজিক দায়িত্ব উল্লেখ করা হলো।

১) **অসহায়দের সাহায্য-সহায়তা** : সমাজের বিধবা, ইয়াতীম ও দুঃস্থদের সাহায্য-সহযোগিতা করা বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ ‘যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনদের সমস্যা সমাধানের জন্য ছুটোছুটি করে সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথাও বলেছেন, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত ছালাত আদায় করে এবং সারা বছরই ছিয়াম পালন করে’।[বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৮২।]

রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া : সমাজের কেউ অসুস্থ হ’লে তার খোঁজ-খবর নেয়া একজন মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব। রুগ্ন ব্যক্তির দেখা-শোনার বিষয়টি ইসলামী শরী‘আতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ- ‘ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর’।বুখারী, মিশকাত, হা/১৫২৩।

অন্যত্র তিনি বলেন, عُوْدُو الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে (কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে), তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮১, হাদীছ ছহীহ।]

এটা বিরাট পূণ্যের কাজও বটে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ 'একজন মুসলিম যখন তার কোন রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায় তখন সে যেন জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।মুসলিম হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৫২৭।

৩) **শোকাহতকে সান্ত্বনা প্রদান** : সমাজের কোন ব্যক্তি কোন দুর্ঘটনায় পতিত হ'লে তার পাশে দাঁড়ানো, তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা ও আশার বাণী শোনানো বিরাট ছওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - 'যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন'।[ইবনু মাজাহ হা/১৬০১, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৬৪।]

৪) **মৃতব্যক্তির পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য সরবরাহ** : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন শোকে মুহ্যমান থাকে। ঐ সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য হ'ল তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। মুতার যুদ্ধে জা'ফর (রাঃ) শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ 'তোমরা জা'ফরের (রাঃ) পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা কর, কেননা আজ তাদের প্রতি এমন জিনিস বা এমন বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে'।[ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; আবুদাঊদ হা/৩১৩২ সনদ হাসান]

৫) **প্রতিবেশীর খবর রাখা ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা :** পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া একজন মুসলিমের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ-

'আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর' (নিসা ৩৬)।

৬) **ঋণ প্রদান** : জীবনে চলতে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিতো বটেই, এমনকি সচ্ছল ব্যক্তিরও কখনো কখনো ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হ'তে পারে। এ অবস্থায় যার নিকট ঋণ প্রদানের মত অর্থ থাকবে তার দায়িত্ব হ'ল 'করযে হাসানা' বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে তার মুসলিম ভাইকে সহায়তা করা। এতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً 'যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে (টাকা-পয়সা) দুইবার ঋণ প্রদান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার ছাদাক্বা করে দেয়ার ছওয়াব লিখা হবে'।[ছহীহুল জামে' হা/৫৭৬৯, সনদ ছহীহ।]

সমস্যাগ্রস্তের সমস্যা সমাধান করা : সমাজের কোন লোক যখন সমস্যায় আক্রান্ত হয় তখন সকলের কর্তব্য হ'ল তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কোন দুঃখ দূর করবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন'।[বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০।]

রাসূল ﷺ আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন।

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩০; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬।

(৮) **ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফয়ছালা করা :** সমাজে কোন বিষয়ে কোন বিবাদ দেখা দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে এর সমাধান করা ইসলামের নির্দেশ। এতে ছাদাক্বার ছওয়াব পাওয়া যায়। বিবাদ ফায়ছালার জন্য আল্লাহর নির্দেশ, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْن. 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে' (হুজুরাত ৪৯/১০)।

৯) **সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ** : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব। সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজের নিষেধ করা সম্পর্কে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْن 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম' (আলে-ইমরান ১০৪)। [12]

কুরআনের আলোকে মুমিনের রাষ্ট্রীয় জীবন

وَ لَقَدۡ کَتَبۡنَا فِی الزَّبُوۡرِ مِنۡۢ بَعۡدِ الذِّکۡرِ اَنَّ الۡاَرۡضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصّٰلِحُوۡنَ ﴿۱۰۵﴾

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি যাবুরে (কিতাবে) উপদেশাত্মক লিপিবদ্ধ করেছি—নিশ্চয়ই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার সৎকর্মশীল সুযোগ্য বান্দাগণ। (সুরা- আম্বিয়া, আয়াত: ১০৫)।

তাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে কীভাবে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন, তা-ও বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর কালামে। '

اَلَّذِیۡنَ اِنۡ مَّکَّنّٰهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَوُا الزَّکٰوۃَ وَ اَمَرُوۡا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَهَوۡا عَنِ الۡمُنۡکَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَۃُ الۡاُمُوۡرِ ﴿۴۱﴾

আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দিলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজে আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে; সকল কাজের পরিণাম ফল আল্লাহরই এখতিয়ারে।' (সুরা-হজ, আয়াত: ৪১)।

মানবজাতির দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা শত পুস্তিকা ও চারটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি মহাগ্রন্থ 'কোরআন কারিম'। আল্লাহর বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসংখ্য নবী, রাসুল পাঠিয়েছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সর্বশেষ নবী ও রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঠিয়েছেন খোদায়ি বিধান ইসলামের পূর্ণতা দানের জন্য।

প্রিয় নবী (সা.) আইয়ামে জাহিলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে আরবের মক্কা নগরে শুভাগমন করেন। সে সময় আরব ও মক্কা ছিল অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও অপরাধ-অরাজকতার স্বর্গরাজ্য। মানুষকে হাটে-বাজারে বিক্রি করা হতো। নারীদের মানুষরূপে গণ্যই করা হতো না। শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। ধর্মের নামে অধর্ম চর্চা হতো। অশ্লীলতা চরম রূপ পরিগ্রহ করেছিল। নারী ও পুরুষ বিবস্ত্র হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করত। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বংশানুক্রমিকভাবে যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকত। মানুষ মানুষের রক্ত পান করত, হত্যা করে কলিজা চিবিয়ে খেত।অশান্তির দাবানলে

জ্বলতে থাকা নরকসম স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে এলেন মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। আহ্বান করলেন ঐক্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার। কায়েমি স্বার্থবাদী কিছু অমানুষের কারণে তা সম্ভবপর হচ্ছিল না। শান্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ ও পরম সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন। মদিনা ও মদিনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিকসহ নানা ধর্মের ও নানা বর্ণের এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির লোকদের নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন; যা জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার মানবিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই ঐতিহাসিক চুক্তি ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটি পৃথিবীর প্রথম লিখিত সনদ ও প্রথম সংবিধান। এ চুক্তির নানামুখী উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল যুদ্ধের পরিবর্তে পরস্পরের শান্তিপূর্ণ অবস্থান। আরও উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারিত, নিপীড়িতকে সাহায্য করা এবং চুক্তিভুক্ত সব পক্ষের মান–মর্যাদা ও ধর্মবিশ্বাসের অধিকার সংরক্ষণ করা।

ইসলামি সমাজ বা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মানে শান্তির জন্য ধর্মীয় বিধান তথা ইসলামি শরিয়ত কার্যকর করা। ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলির মৌলিক উদ্দেশ্য পাঁচটি। যথা: জীবনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান; সম্পদের মালিকানা নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান; জ্ঞানের সুরক্ষা ও সুকুমারবৃত্তি বিকাশ; প্রজন্মের পবিত্রতা, বংশপরম্পরার ধারাবাহিকতা ও মানবসভ্যতা সুরক্ষা করা; ধর্মকর্ম ও বিশ্বাসের সুরক্ষা প্রদান করা।

বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (সা.) মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা দিয়ে বললেন, 'মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তেমনি পবিত্র ও সুরক্ষিত, যেমন হজের দিবস, আরাফাতের ময়দান, মক্কা নগরী ও কাবাঘর পবিত্র ও সুরক্ষিত।' (মুহাম্মাদ ইবনে কাসির)। [১৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

১. একমাত্র আল্লাহ রাববুল আলামীনই বিধানদাতা। প্রকৃতির বিধান তো তাঁরই, মানবজাতির জীবনযাপনের বিধানও একমাত্র তিনিই দান করতে পারেন।

২. রাষ্ট্রের সকল বিধি-বিধানের ভিত্তি হবে কুরআন-সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না এবং কোনো ব্যবস্থাপনাগত বিধানও কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হতে পারবে না।

৩. রাষ্ট্র কোনো শ্রেণী, ভাষা, ভূ-খন্ড বা এ জাতীয় কোনো চেতনার ভিত্তিতে গঠিত হবে না। রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হবে সেই সব বিধান ও লক্ষ্য, যার বুনিয়াদ ইসলামপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হবে কুরআন-সুন্নাহয় নির্দেশিত ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন। ইসলামের শিআর ও নিদর্শনসমূহের স্বমহিমায় পুনরুজ্জীবন এবং স্বীকৃত ইসলামী দলগুলোর জন্য তাদের নিজস্ব মতাদর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য হবে, বিশ্ব মুসলিমের সাথে ঐক্য ও একাত্মতাকে সুদৃঢ় করা এবং রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীদের মাঝে জাহহেলিয়াতের বিভেদ-বিভাজনের প্রেরণা যথা-বংশ, ভাষা, অঞ্চল ও অন্যান্য পার্থিব বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বিভেদ-চেতনার পথ রুদ্ধ করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষার শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. রাষ্ট্র জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এমন সকল নাগরিকের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্বশীল হবে, যারা উপার্জনে সক্ষম নয়, কিংবা কর্মহীনতা বা অন্য কোনো কারণে বর্তমানে আয়-উপার্জনে অক্ষম।

৭. রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ইসলাম প্রদত্ত সকল অধিকার লাভ করবেন। অর্থাৎ আইনী সীমারেখার মধ্যে জানমাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, ইবাদত ও উপাসনার অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, নিরাপদে চলাচলের অধিকার, সভা-সমাবেশের অধিকার, আয়-উপার্জনের অধিকার, উন্নতির ক্ষেত্রগুলোতে সমতা এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের অধিকার।

৮. উপরোক্ত কোনো নাগরিক অধিকার ইসলামী আইনের বৈধ সনদ ছাড়া কোনোভাবেই হরণ করা যাবে না। কোনো অপরাধের অভিযোগে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ও আদালতের রায় ছাড়া কোনো প্রকারের শাস্তি দেওয়া যাবে না।

৯. স্বীকৃত ইসলামী দলগুলো আইনের ভেতর থেকে সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। অনুসারীদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অধিকার তাদের থাকবে। তারা তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রচার করতে পারবে। তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান তাদের ফিকহী মাযহাব অনুযায়ী হবে এবং এ রকম ব্যবস্থাও উপযোগী হবে যে, তাদের বিচারকই এই ফয়সালা করবেন।

১০. রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরও আইনের মধ্যে থেকে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধান তাদের ধর্মীয় বিধান ও প্রথা অনুযায়ী করার অধিকার থাকবে।

১১. রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের সাথে শরীয়তের গন্ডির মধ্যে যে সব চুক্তি করা হয়েছে তা মেনে চলা অপরিহার্য। ৭ নং ধারায় যে সব নাগরিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, দেশের অমুসলিম নাগরিকরাও তা সমানভাবে লাভ করবেন।

১২. রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই মুসলিম পুরুষ হতে হবে, যার সততা, যোগ্যতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি) আস্থাশীল থাকবেন।

১৩. রাষ্ট্রপ্রধানই হবেন রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলার মূল দায়িত্বশীল। তবে তিনি তার দায়িত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ কোনো ব্যক্তি বা দলের নিকট অর্পণ করতে পারবেন।

১৪. রাষ্ট্রপ্রধানের রাষ্ট্র পরিচালনা একনায়কসুলভ হবে না। বরং তা হবে শূরা ভিত্তিক অর্থাৎ তিনি শূরার সদস্য ও মনোনীত প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫. রাষ্ট্রপ্রধান সম্পূর্ণ সংবিধান বা তার অংশবিশেষ বাতিল করে শূরাবিহীন রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকারী হবেন না।

১৬. যারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন তারা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে তাকে অপসারণের ক্ষমতাও সংরক্ষণ করবেন।

১৭. নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণ মুসলমানদের সমপর্যায়ের হবেন এবং আইনের জবাবদিহিতার উর্ধ্বে হবেন না।

১৮. সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিক সবার জন্য অভিন্ন আইন ও নীতি প্রযোজ্য হবে এবং উভয় শ্রেণীর উপর সাধারণ আদালতই তা কার্যকর করবে।

১৯. বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাধীন থাকবে, যাতে বিচারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

২০. এমন কোনো মতবাদ ও

চিন্তাধারা প্রচার নিষিদ্ধ থাকবে, যা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি ও আদর্শ ধ্বংসের কারণ হয়।

২১. রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভাগ একই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। গোষ্ঠি, ভাষা বা বংশভিত্তিক আলাদা আলাদা অংশ নয়। শুধু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কার্যনির্বাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা বৈধ হবে। তারা কখনো কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার লাভ করবে না।

২২. সংবিধানের এমন কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না, যা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী। [১৪]

কুরআনের আলোকে মুমিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ইতিহাস বলে - কোন জাতির ব্যর্থতার শুরুটি কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতি থেকে হয় না। সেটির শুরু হয় ব্যর্থ শিক্ষা খাত থেকে। তেমনি জাতির উত্থান, বিজয় ও গৌরবরবময় জীবনের শুরুটিও শিক্ষাঙ্গণ থেকে হয়। যেই জাতির ওহীর শুরু হয়েছে ইকর (পড়ো) দিয়ে,সেই জাতি আজ সবচেয়ে অশিক্ষিত, অলস, ভঙ্গুর জাতি।ইসলাম যে সংস্কৃতির জন্ম দেয় তাতে মানুষ লাগাতর ঈমানদার, সভ্যতর ও সৎকর্মশীল হয়। তখন সভ্য ও ঈমানদার মানুষের সাথে নির্মিত হয় সভ্য সমাজ ও সভ্য রাষ্ট্র। এ পথই হলো মহান নবীজী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের পথ। এ পথ ধরেই মুসলিমগণ অতীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল।

মুসলমানদের সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে Joshep Macup বলেন, Even the lowest classes among the people were eager to read books and that the Laborers world rather spend all they world earn on books than on improving their ragged clothes or their meager meals. যোশেফ ম্যাকোপ আরো বলেন, There was a laborer whose library was eagerly frequented by scholars.

ইসলামী সভ্যতা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিকাশে এতটা কার্যকর অবদান রেখেছিল যে পণ্ডিত, লেখক এবং বাগ্মীর একটি বিরাট দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যারা খলিফাদের দরবার থেকে শুরু করে মসজিদ, রাজদরবার থেকে শুরু করে মানুষের বসতি, সেনাপতির পদ থেকে বিভিন্ন সমাবেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কোনো জায়গাই জ্ঞানচর্চার বাইরে ছিল না। সর্বত্র গড়ে উঠেছিল শিক্ষালয়, পাঠাগার এবং গবেষণাকেন্দ্র।[14]

ইসলামি সংস্কৃতির নির্মাণ হয় সুশিক্ষার জন্য । এ শিক্ষার সিলেবাসে অবশ্য থাকতে হয় ওহীর জ্ঞান তথা কুর'আন-হাদীসের জ্ঞান। বস্তুত সে জ্ঞানই হলো ঈমান ও বিবেকের খাদ্য। ওহীর জ্ঞানের অভাবে জন্ম নেয় যে অপধর্ম ও অপসংস্কৃতি -তা দেয় বেঈমান ও দুর্বৃত্ত হওয়ার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেয় পাপাচারে তথা দুর্বৃত্তিতে। অপধর্ম ও অপসংস্কৃতির সে ধারকগণ তখন দ্রুত ধাবিত হয় আদিম অজ্ঞতার দিকে।

জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল মুসলমানদের প্রথম কাজ। মুসলমানদের অবদানের কথা স্বীকার করে Benjamain Tudell (মৃত্যু-১১৭৩ সাল) বলেছেন, In Alexandaria, I saw 20 schools that were active. Moreover, in addition to public schools, these were universities that had been established in Bagdad, Cairo, Cordova etc. Which have laboratories, a planetarium and huge libraries, for instance, there were 70 public libraries in andalusia. বেঞ্জামিন টিউডেলের ভাষায়- মুসলিম দেশগুলো ছিল শিক্ষা ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। এ জন্য সেখানে গড়ে উঠেছিল জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার। এক পরিসংখ্যান মতে, কর্ডোভার আল-হাকেম লাইব্রেরিতে ছয় লাখ বই বর্তমান ছিল। যেগুলো ৪৪টি ক্যাটালগে সন্নিবেশিত ছিল। অথচ তার ৪০০ বছর পর প্যারিসে Charles & Wise যে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে তিনি মাত্র ৯০০ বই সংগ্রহ করেছিলেন, যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল ধর্মীয় বই। মধ্যযুগে ইউরোপের মানুষ যখন অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশ করেছিল, তখন সেখানে শিক্ষার হার ছিল এক শতাংশেরও কম। অথচ মুসলিম বিশ্ব সেই সময়ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ইউরোপের লোকেরা তখন পুস্তক ও পাঠাগারের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত ছিল। অথচ মুসলিম জগৎ ছিল বই ও পাঠাগারে সমৃদ্ধ। তখন বাগদাদের বায়তুল হাকেম লাইব্রেরিতে বর্তমান ছিল চার লাখ বই। কায়রোর রয়্যাল লাইব্রেরিতে ১০ লাখ বই ও বর্তমান লেবাননের ত্রিপলি লাইব্রেরিতে তিন লাখ বই বর্তমান ছিল। আর স্পেনে প্রতিবছরই প্রকাশিত হতো ৭০ থেকে ৮০ হাজার বই। [১৫]

প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আল্লামা আবুল হাশিম তার ‘ক্রিড অব ইসলাম’ গ্রন্থে বলেন, ‘মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলোর ইসলামী নীতি, আদর্শ ও শিক্ষাসম্মত উৎকর্ষসাধন পদ্ধতি এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বাস্তব রূপ হলো ইসলামী সংস্কৃতি।’

ইসলামি সংস্কৃতি ও শিক্ষা হলো - -

১. ঈমানের পূর্ণতা সাধন : পারিভাষিক অর্থে, নবী করিম সা:-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রণীত সব বিষয়ের প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা, মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান ও সে অনুযায়ী আমল করাকে শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। ইসলামী সংস্কৃতি হলো ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়। কেননা এখানে ইসলামের নীতি ও দর্শন বাস্তব রূপ লাভ করে। আর তাই ইসলামী সংস্কৃতি ঈমানের পূর্ণতা দান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘হে মুমিনগণ! তোমারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না।’ (সূরা আল বাকারা-২০৮)

২. ঈমান সংরক্ষণ : ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ঈমানভিত্তিক। আর তাই এই সংস্কৃতি মুমিনের ঈমান অক্ষুণœ রাখার রক্ষাকবচ। তাওহিদ, রিসালাত, কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত প্রভৃতি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন এবং ঈমান সংশ্লিষ্ট অনুশীলন এ সংস্কৃতির মূল উপাদান। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো দলের অনুসরণ করো তাহলে ঈমান থেকে বিচ্যুত করে তারা তোমাদের কাফির হিসেবে প্রত্যাবর্তন করাবে।’ (সূরা আলে ইমরান-১০০)

৩. দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জন : ইসলামী সংস্কৃতি একই সাথে দুনিয়া ও আখিরাতমুখী। এতে দুনিয়ার জীবনকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয়নি; বরং যথার্থ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আখিরাতের জীবনকে বলা হয়েছে মূল বিবেচ্য বিষয়। এভাবে ৪. আল্লাহ ও রাসূল সা:-এর ভালোবাসা লাভ : ইসলামী সংস্কৃতি মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী ও রাসূল সা:-এর জীবনাদর্শভিত্তিক। এর প্রধান উৎস হলো আল কুরআন ও সুন্নাহ। তাই এই সংস্কৃতির অনুশীলন বলতে বোঝায় আল্লাহর নির্দেশ পালন ও রাসূল সা:-এর জীবনাদর্শের অনুশীলন। এটি অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল সা:-এর প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তাঁদের ভালোবাসা লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন- ‘মুহাম্মদ সা: আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা চাও তাহলে আমাকে অনুসরণ করো।’ (সূরা আলে ইমরান-৩১)

৫. মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষা : সংস্কৃতি জাতির পরিচিতির প্রতীক। ইসলামী সংস্কৃতিতে মহান আল্লাহর বিধিবিধান ও রাসূল সা:-এর পরিচালিত জীবনব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত হয়। এগুলো ব্যতীত কোনো মুসলিম যদি অন্য কোনো জাতির সংস্কৃতি অনুসরণ করে তাহলে সে মুসলিম থাকে না। রাসূল সা: বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ)

আর তাই ইসলামী সংস্কৃতি হলো মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান উপায়। [১৫]

কুরআনের আলোকে মুমিনের অর্থনৈতিক জীবন

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের পরতে পরতে প্রতিটি প্রসঙ্গে আলো ফেলেছে ইসলামের ঐশী বিধান। ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত যেমন ফরজ ইবাদত, তেমনি হালাল উপায়ে সম্পদ উপার্জন করাও আবশ্যক। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'হালাল উপার্জন করাও অন্যান্য ফরজের পর একটি ফরজ কাজ।' (বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান : ৮৭৪১)

হালাল গ্রহণ করা আল্লাহতায়ালার হুকুম। ইরশাদ হচ্ছে,

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾

'হে মানুষ! পৃথিবীতে হালাল ও তাইয়্যেব যা রয়েছে, তা থেকে আহার করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সুরা বাকারা : ১৬৮)।

ইবাদত কবুলের জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণ অন্যতম শর্ত। অর্থাৎ অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করে ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ১০ দিরহাম দিয়ে কোনো বস্ত্র ক্রয় করে এবং সেই ১০ দিরহামের মধ্যে একটি দিরহামও হারাম হয়, যতক্ষণ সেই বস্ত্র তার পরিধানে থাকবে ততক্ষণ তার নামাজ কবুল হবে না।' (মুসনাদে আহমদ : ৫৭৩২)

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তার কসম, নিশ্চয়ই কোনো বান্দার পেটে যদি এক লোকমাও হারাম খাবার প্রবেশ করে, ৪০ দিন পর্যন্ত তার ইবাদত কবুল হবে না। আর যে রক্ত-মাংস হারাম সম্পদ বা সুদের টাকায় বৃদ্ধি হয়েছে, তার জন্য জাহান্নামই উত্তম।' (আলমুজামুল আওসাত : ৬৪৯৫; আত তারগিব ওয়াত তারহিব : ২৬৬০)

ইসলামে হারাম ও অবৈধ উপার্জনকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হারাম সম্পদের তুচ্ছতায় তা মাটির সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমার প্রাণ যার হাতে তার কসম, তোমাদের কেউ মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম হলো সে তার রশি নিয়ে পাহাড়ে যাবে এবং কাঠ সংগ্রহ করবে। অতঃপর তা পিঠে বহন করে এনে বিক্রি করবে এবং আহারের ব্যবস্থা করবে। আর তোমাদের কেউ হারাম খাওয়ার চেয়ে উত্তম হলো নিজের মুখের মধ্যে মাটি ভরা।' (মুসনাদে আহমাদ : ৭৪৯০)।

অবৈধ পথে সম্পদ উপার্জন করলে কেয়ামতের কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'কেয়ামতের ময়দানে কোনো বান্দা তার এক পাও নড়াতে পারবে না; যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে—১. সে তার জীবন কোন পথে শেষ করেছে। ২. যতটুকু ইলম শিখেছে তার ওপর কতটুকু আমল করেছে। ৩. সম্পদ কোন পথে আয় করেছে। ৪. এবং কোন পথে ব্যয় করেছে। ৫. নিজের যৌবনকে কোন পথে শেষ করেছে।' (তিরমিজি : ২৪১৭)।

সুতরাং আমরা যখন সম্পদের আয়-ব্যয়ের হিসাব করি তখন কোন পথে আয় করছি এবং কোন পথে ব্যয় করছি সেটারও হিসাব নিতে হবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে জাকাত ও ফিতরার প্রচলন করা হয়েছে। যাতে ধন-সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে ঘুরপাক না খায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার।' (সুরা জারিআত, আয়াত : ১৯)। আমরা সহিহ হাদিস থেকে জানতে পারি, পবিত্র রমজানে এক টাকা দানে সত্তরের অধিক টাকা দানের সওয়াব পাওয়া যায়। তাই জাকাত, সদকা (দান) ও ফিতরা প্রদানের উত্তম সময় নিঃসন্দেহে এই রমজান মাস। ইসলামে জাকাত কে দেবে, কে পাবে, কোন কোন খাতে ব্যয় হবে ইত্যাদি সব সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। জাকাত দানকারীর সম্পদের নিসাব (নির্ধারিত পরিমাণ) হলো ৭ তোলা সোনা অথবা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্য অথবা সমমূল্যের নগদ অর্থ বা ব্যবসা পণ্য যদি বছরান্তে অবশিষ্ট থাকে, তবে তার সম্পদের শতকরা আড়াই শতাংশ হিসাবে আল্লাহর নির্ধারিত খাতে গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়।

পবিত্র কোরআনে সুরা তাওবার ৬০ আয়াতে বলা হয়েছে, জাকাত আট শ্রেণির মানুষের মাঝে বণ্টন করতে হবে—১. ফকির, ২. মিসকিন, ৩. জাকাত আদায়কর্মী, ৪. নও মুসলিম ও অনুরাগী, ৫. দাস-দাসী মুক্তিপণ, ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ৭. ইসলামের পথে সংগ্রামরত ব্যক্তি, ৮. বিপদগ্রস্ত মুসাফির। এই আট শ্রেণির মধ্যে জাকাতের অর্থ বণ্টন করে দেওয়া যাবে। কুরআনের আলোকে মুমিনের অর্থনৈতিক জীবন হবে হালালের সম্ভার। এবং অবশ্যই সে তাঁর হালাল রিজিক থেকে সাদাকাহ,অপরের হক, ও নিসাব পরিমান সম্পদ হলে যাকাত ও ফিতরা আদায় করবে।

উপসংহার

আবার ও মুমিনের জীবনে ফিরে আসুক কুরআন নামক বটবৃক্ষটি। যাঁর ছায়াতলে থেকে মুমিন জীবনের ঝড়ো হাওয়া , আকস্মিক বিপদ, ও পরকালের কঠিন বির্পযয় থেকে বাঁচার আশ্রয় টুকু খুঁজে   পাবে। মুমিন আবার ফিরে আসুক কুরআনের কাছে তার হারানো ঐতিহ্য আর দাপট কে ফিরে পেতে। অন্তরগুলো আবার ও সতেজ ও প্রানবন্ত হয়ে উঠুক কালামুল্লাহর ফিকিরে,তাঁর ভালোবাসায়, তাদাব্বুরে, ও তিলওয়াতে। আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে বোঝার ও মানার তৌফিক দান করুক। আমিন ইয়া রব!

সহায়িকা

১.https://m.dailyinqilab.com/article/261364/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3

২. https://www.muslimmedia.info/2020/08/11/surah-hud

https://muslimmatters.org/2017/08/25/surah-hud-has-made-me-grow-old/?fbclid=IwAR2oSpLacZjbA0JSyawaIfnh7dHP7GyjZsbB30YVA_tkk7AkCGTOIYErPK4

৪.https://www.jugantor.com/todays-paper/features/islam-and-life/85146/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0

৫. https://www.bjilibrary.com/

৬. গন্থ : কুরআনের সাথে পূর্বসূরীদের আচরণ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৮

৮.https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/01/16/1111183

৯.
https://medium.com/@tanvirraj/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-4d153d7cfc7f

১০.
https://www.prothomalo.com/religion/islam/0mdcud6qcm

১১. বই কুরআন বোঝার মজা পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯-২৮

১২. https://at-tahreek.com/

১৩.https://www.prothomalo.com/opinion/column/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0

১৪.https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhormo/2014/09/05/124926

১৫. https://www.dailynayadiganta.com/diganta-islami-jobon/786106/-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC

১৬. https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/joto-mot-toto-path/76774